অনন্যার পূজা-সংখ্যার প্রস্তুতি-পর্বে এদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের কাছ থেকে আমরা যে অকুন্ঠ সহযোগিতা পাচ্ছি, তার জন্য প্রারম্ভেই আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে রাখছি তাঁদের। পূজা-সংখ্যার পরিকল্পনাটিকে একটি নিখুঁত রূপারোপের আয়োজনে যে সাহিত্য সূচী রচনা করা হয়েছে, সে কথা স্মরণ রেখে সহজেই বলা যায়, রুচি-শীল সাহিত্য-মনের কাছে তা একটি অনবদ্য সংকলনরূপে পরিগণিত হবে। সংগ্রহ পরিকল্পনায় সাহিত্যের সামগ্রিক দিকের প্রতি একটি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। অনুসন্ধান করা হয়েছে সেই সব সৃষ্টির যা শুধু সাহিত্য পিপা-

সাকেই পরিতৃপ্ত করে না, আনন্দদান করে সন্ধানী মনকে। মননশীল চিত্তের নানাদিকের বহু জটিলতম সমস্যা বিভিন্ন রচনায় যে সাবলীল ভঙ্গী ও স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকাশিত হয়েছে তা নবযুগের সাহিত্য-উদ্যোগের একটি সুদৃঢ় পদক্ষেপ। পূজা সংখ্যায় গল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা ও বিভাগীয় রচনা ছাড়াও দুটি বিখ্যাত উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হচ্ছে। ঈশ্বরচন্দ্রের "ভ্রান্তি-বিলাস" ও আর্নেস্ট হেমিংওয়ের "ফর হুম দি বেল টোলস"। অন্যান্য রচনা সম্ভারের সঙ্গে এই দুটি উপন্যাস পূজা-সংখ্যার পরিপূর্ণতার সংযোগ সাধক।

অনন্যা

দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ১৩৬৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬২

বর্ত্তমান ভারত

স্বামী বিবেকানন্দ

সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা অচিরেই অধিকৃত হউক বা বাহুবলের দ্বারা বা নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—হয়।

প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে সাধারণ প্রজা, সমস্ত শক্তির আধার এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্ব্বল। সৃষ্টি করিয়া, আপনাদের সমস্ত অধিকার কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা; যাহাদের হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যতকাল নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে এইভাব থাকিবে ততকাল রহিবে।

ছলবল কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক।

ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ, স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্তও অসম্ভব।

মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীষী, মুনি? চিন্তাশীলতার লোপের সঙ্গে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব, জড়ত্বের আগমন।'

বলবানের দিকে সকলে যায়; গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোনও প্রকারে একটু লাগে, দুর্বল মাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয় বেশভূষামণ্ডিত দেখি তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত!

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শংকর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল, দিন রাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

[বর্তমান ভারত ১৮৯৯

যাত্রার কথা

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতায় এবং তন্নিকটস্থ প্রদেশে, ভদ্র লোক এক্ষণে যাত্রার প্রতি হতাদর হইয়াছেন বটে। কিন্তু যাত্রাই এক্ষণকার গ্রাম্য উৎসব। তদুপলক্ষে বারইয়ারী, তদুপলক্ষে ভিক্ষা, তদুপলক্ষে চুরি পর্যন্ত হইয়া থাকে। যাত্রাকরেরা উপাস্য ব্যক্তি; তাহাদের আনিতে হইলে উপাসনা করিতে হয়।

এই কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রথমত বোধ হইবে যে, বাংগালার আধুনিক যাত্রা অশ্রুতপূর্ব উন্নতি-প্রাপ্ত হইয়াছে, নতুবা এত তাহার আদর কেন? যাত্রা শুনিতে লোকের এতই ব্যগ্রতা কেন? বস্তুত আধুনিক যাত্রার সর্বদাই প্রশংসা শুনা যায়। কিন্তু প্রশংসা, সকল সময় গুণের পরিচায়ক নহে। অনেক সময় বরং তাহার বিপরীত বুঝায়। যিনি প্রশংসা করেন, তিনি যদি স্বয়ং গুণগ্রাহী হন, তবেই তাঁহার প্রশংসা গুণব্যঞ্জক, নতুবা সন্দেহস্থল।

'অমুক অধিকারী বড় যাত্রা করিয়াছে, মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার উপলক্ষে কেমন তামাদি ও নাতকজারী ঘটাইল। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কথায় নাতকজারী ঘটান অল্প গুণপনা নহে। পরমানন্দ কি শ্রীদামশুভল প্রভৃতি প্রাচীন যাত্রাকরের প্রশংসা কর। কিন্তু তাহারা কি এরূপ নাতকজারী ঘটাইতে পারিত? সাধ্য কি! তাহারা এরূপ আইন আদালতের কথা কখনও জানিত না।' আধুনিক যাত্রার এই এক জাতীয় প্রশংসা।

গত রাত্রে দূতী এক চক্র শব্দ লইয়া কি চমৎকার গুণপনা দেখাইল। রথচক্র, রমণীচক্র নয়নচক্র, প্রেমচক্র চক্রীর চক্র এইরূপ কতচক্র সাজাইল। এমন যাত্রা কি হয়! এ যাত্রা শুনিলে কথা শেখা যায়, অভিধানপাঠের ফল হয়। এই আর এক জাতীয় প্রশংসা।

এই সকল প্রশংসা শুনিলে অনেকেই দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই। আমাদের যাত্রার অবস্থা বড় অপকৃষ্ট, এবং শ্রোতৃগণের রুচি ততোধিক অপকৃষ্ট বলিয়া তাহা এ দেশীয় অন্যান্য নৃত্যগীত-তাহাদের বোধ হইবে। কিন্তু আমরা যাত্রাকে উপলক্ষ করিয়া যাহা বলিতেছি, তাহা এ দেশীয় অন্যান্য নৃত্যগীত-পদ্ধতি পক্ষেও বর্তিবে।

যাত্রার প্রসংগ হইলে অগ্রেই নৃত্যের কথা মনে পড়ে। সুর, তাল, লয়, মান, বেশবিন্যাস, কথাবার্তা, অংগভংগি, সকলই মনে হয়, কিন্তু নৃত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ

বিশেষ আছে। এক্ষণকার যাত্রায় নৃত্যই প্রবল, সকলেই নৃত্য করে। কি মেহতর, কি ভিস্তি, কি মালিনী, কি বিদ্যা, সকলেই নৃত্য করে। কৃষ্ণ নৃত্য করেন, রাধা নৃত্য করেন, রাবণ নৃত্য করেন, সীতা নৃত্য করেন, কৈকেয়ী নৃত্য করেন, বোধ হয়, বৃদ্ধ রাজা দশরথও নৃত্য করিতেন, কিন্তু তিনি প্রায় সকল যাত্রার দলে, 'বিহালওয়ালা'। নৃত্য করিতে গেলে বিহালা বন্ধ হয়, নতুবা তাহার ছুটী হইত না।

যে কোন সমাজেই হউক, নৃত্য বলিলে পদদ্বয়ের সঞ্চালনজনিত দেহের মনোহর আন্দোলন বুঝায়। কিন্তু বঙ্গ সমাজে কেবল দেহের মধ্যভাগের সঞ্চালনজনিত দেহের যে ঘৃণিত আন্দোলন, তাহাকেই নৃত্য বলে। কি লজ্জাকর নৃত্য! বাঙ্গালী সভ্য হইয়াছে, এই জন্য এই নৃত্য আপনি দেখে, কন্যাকে মাতাকে দেখায়, বালকবালিকাকে দেখায়, আবার বাহবা দেয়। বাহবা কাহার প্রাপ্য? বোধ হয়, বাহবা আমরাই পাইতে পারি।

যে নৃত্য লইয়া বাঙ্গালা উন্মত্ত হইয়াছে, এক্ষণকার সুর সেই নৃত্যের প্রতিপোষক এবং উদ্দীপক। বাঙ্গালার আর পূর্ব সুর নাই। যে সুর শুনিলে যেন জন্মান্তরীণ সুখ চকিতের ন্যায় স্মরণপথে আসিয়া হৃদয় কম্পিত করিয়া যাইত, আর সে সুর নাই। যে সুর ধীরে ধীরে তোমার রক্ত স্তম্ভিত করিয়া তোমায় অবশ করিয়া যাইত, এক্ষণে আর সে সুর নাই। সে সুর শুনিলে সামান্য প্রদীপ হইতে নয়ন ফিরাইয়া চন্দ্রালোকপ্রতি চাহিতে, এক্ষণে আর সে সুর নাই। এক্ষণে বাঙ্গালার সুর পরিবর্তিত হইয়াছে। বাঙ্গালার নৃত্যানুযায়ী সুর হইয়াছে।

যাহারা আধুনিক যাত্রার নৃত্যগীত সহ্য করিতে পারেন, তাঁহারা এক প্রকার মহাপুরুষ। আবার যে মহাত্মারা অভিনেতৃগণের বেশভূষা দেখিয়া কথাবার্তা শুনিয়া মোহিত হয়েন, তাঁহাদের ত কথাই নাই। আমাদের যাত্রাকরেরা ইতর লোক। যাত্রাওয়ালা না হইলে তাহারা হয়ত ভূমিকর্ষণ করিত বা নৌকা চালাইত কিম্বা ভারবহন করিত, তাহাদের নিকট উৎকৃষ্ট কিছুরই প্রত্যাশা করা যায় না।

স্বতন্ত্র প্রকৃতির স্বতন্ত্রগতি, স্বতন্ত্র কথা। তাহাদের ভাষা এক হইতে পারে। কিন্তু ভাষার মর্ম স্বতন্ত্র। সেই স্বতন্ত্রতা আমাদের দেখাইয়া দিলে। আমরা বুঝিতে পারি। তাহা কেবল প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা দেখাইয়া দিতে পারেন।

[যাত্রা সমালোচনা পুস্তিকা ১৮৭৫

[প্রায় একশো বছর হতে চললো বাংলার থিয়েটারের আরম্ভ। এ সময় সাধারণ আমোদপ্রমোদের জন্য যাত্রা-গান একমাত্র সম্বল ছিল। যা আবদ্ধ ছিল সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে। এজন্য বাংলার প্রথম নাটকার মাইকেল মধুসূদন দুঃখ করে গেছেন। শিক্ষিত রুচিশীল সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে এর সম্ভাবনার আশা করেছিলেন সে যুগের বহু বিদগ্ধ মনীষী। তাঁদের মধ্যে বঙ্কিম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র। প্রায় নব্বই বছর আগে তাঁর এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ মারফৎ শিক্ষিত জনের কাছে বাংলার যাত্রা অভিনয়ের অপকৃষ্টতা দেখিয়ে আক্ষেপ করেছেন। প্রায় শত বছরের ব্যবধানে আজ কলকাতায় সেই যাত্রা-গানের উজ্জ্বল দিক দেখানো হচ্ছে। বাংলার নিজস্ব গতি ঠিক পথই নিয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।]

সে জীবনকে জোঁকের মতো আঁকড়ে আছে

জীবন ও জোঁক

অমরকান্ত

পাড়ায় যে দিন ওর আবির্ভাব হয় তার পর দিন সকালে বাজার করতে গিয়ে ওকে দেখার সুযোগ পাই। শিবনাথবাবুর গৃহের সম্মুখে, রাস্তার অন্য দিকের পড়ো বাড়িতে নিমগাছের তলায় এক ছিপ ছিপে পাতলা কালো লোক ময়লা লুঙ্গি পরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে।

এ ছাড়া সে সময় পর্যন্ত তার সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানতাম না, জানার চেষ্টাও করতাম না। সে দিন সে ঘটনাটি না ঘটে গেলে পাড়ায় প্রসিদ্ধি পেতে ওর বেশ একটু সময় লেগে যেত।

এক সপ্তাহ পর, রাত্রির প্রায় এগারটা বেজেছে, খেয়ে দেয়ে সবে মাত্র বাইরে এসে ঘুমিয়েছি। চারিদিক ঘন আঁধারে ঢাকা। চৈত্র মাস, বাতাস তাই একটু গতিশীল। মাঝে মাঝে রাস্তার ধুলো সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে ফেলেছে। প্রারম্ভিক তন্দ্রা আসতে না আসতেই মার মার রব শুনে চমকে উঠলাম।

শুয়ে শুয়ে চোখ খুললাম, কিছুই নজড়ে পড়ল না। চোখ বুজে আবার ঘুমাবার উপক্রম করলাম। কিন্তু 'মার মার রব' আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল এবং চীৎকারও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পেল। উঠে বসলাম। শব্দ বুঝি শিবনাথবাবুর বাড়ির দিক থেকে ভেসে আসছে। তাড়াতাড়ি চটি পায়ে দিয়ে সে দিকে যেতে হল।

অনুমান ঠিক, শিবনাথবাবুর বাড়ির সামনেই ভিড় একত্রিত হয়েছে। পাড়ার অন্যান্যরাও হৈ হল্লা শুনে বিছানা ছেড়ে চোখ কচলাতে কচলাতে ছুটে আসছে। চক্রব্যূহের ভেতর প্রবেশ করে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দেখলাম, পড়ো বাড়ির সেই ভিখিরীটা দাঁড়িয়ে আছে। শিবনাথবাবুর ছেলে রঘুবীর ভিখিরীটার দু হাত পেছন দিক থেকে ধরেছে এবং দু একজন চোখ বুজে ও লাফালাফি করতে করতে তাকে বেদম মারছে।

ভিখিরীটা বেঁটে, পাগুলো রস বের করা লেবুর মত, চোখগুলো গর্তের ভেতরে সেঁদিয়েছে, বুকের পাঁজরা ময়রার টুকরির সঙ্গে পাল্লা দেয় এবং পেটটা ঈষৎ ফুলে ওঠা। সে সমানে চিৎকার পাড়ছে—'আমি বরই, আমি বরই, আমি বরই...

আমাকে দেখে শিবনাথবাবু আমার কাছে সরে এলেন এবং চিৎকার করে অবস্থাটা পরিস্কার করার চেষ্টা করলেন —ব্যাটা পাকা চোর মশাই। কিন্তু এটা আমাদেরই অপরাধ, লোক চিনতে পারি না আমরা। দুঃখী দেখলে দয়ায় গলে পড়ি আপনি একে দেখেছেনই, মনে হচ্ছিল যেন মাসখানেক থেকে অভুক্ত, কিন্তু কে জানত বেটার আসল রূপ। বজ্জাতের এক শেষ।'

তারপর ভিখিরীটার দিকে তাকিয়ে গর্জন করে উঠলেন উনি 'বল ব্যাটা, শাড়িটা কোথায় লুকিয়েছিস?'

সম্ভবত জোরে কথা বলার জন্য তাঁর গলা কিঞ্চিৎ ভেঙ্গে গিয়েছিল, তাই ক্ষণিকের জন্য তিনি চুপ করলেন। রামজী মিশ্রের বখাটে ব্যায়ামবীর ছেলে সবে মাত্র সে এসেছিল এবং শিবনাথবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই, কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং জুতো হাতে অশ্রাব্য গালিগালাজ সহকারে দু হাত দেখাতে লাগল।

নিশ্চিন্ত হয়ে শিবনাথবাবু তার বক্তৃতা আবার শুরু করলেন—'দু এক সপ্তাহ হয়, পাড়াতে এসেছে। লোভাতুর কুকুরের মত এ দিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়, দেখে আমাদের দয়া হল। একদিন ডেকে বাটিতে ডাল ভাত তরকারি খেতে দিলাম। তা আর কি, লাই পেয়ে বসল। প্রত্যহ আগমন শুরু হল। কিছু মনে করি নি, আপনাদের আশীর্বাদে নিয়মিতই গরিব

দুঃখীরা এসে মঙ্গল কামনা করে যায়। বাড়িতে আসলে সময় অসময়ে দু একটা কাজও করে দিত—দু বেলা পেট পুরে খাওয়াটা ঠিক চাই। কিন্তু কে জানত ব্যাটা আজকে বাড়ি থেকে নতুন শাড়িটা চুরি করে নেবে।'

কথাগুলি বলে তিনি প্রথমে ভিখিরীর দিকে, তারপর একত্রিত জনতার দিকে এবং শেষে আমার দিকে মুখটা বক্র করে চোখ পাকিয়ে এমন ভাবে তাকালেন যেন কোন রকম অসুবিধা না থাকলে 'কাচাই খেয়ে ফেলতেন' লোকটিকে।

'আপনি ঠিক করে জানেন তো এইই শাড়িটা চুরি করেছে?' হেসে নিম্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

স্পষ্টত তিনি আমার উপর রেগে উঠলেন। বললেন—'আপনিও বেশ কথা বলছেন মশাই। যদি এটাই জানা গেল তবে চোর চোর কিসে? আমার ভাল করে জানা আছে চুরির জিনিস সাবধানে রাখে এরা এবং যে পর্যন্ত না এদের বেশ ভাল করে উত্তম মধ্যম দেওয়া যায়, এরা বলবে না। এখন এইটেই দেখুন প্রায় দশটার সময় শাড়িটা চুরি গেছে। যমুনার কথা অনুসারে প্রায় সে সময়ই সে একে কোনো বস্তুর সংগে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখেছে। আমার জিজ্ঞাসা, গত দশ বছর ধরে আমার বাড়ির দরজা এভাবেই খোলা থাকে, কোনো দিন চুরি হল না। আর এর আসতে না আসতেই পাড়াতে চুরি বাটপারি শুরু হয়ে গেল। আমি এই ব্যাটাদের ভাল করে চিনি মশাই।'

সেই ভিখিরীটা মার খেতে খেতে শুধু চিৎকার করছিল—'আমি বরই, আমি বরই, আমি বরই...।' স্পষ্টত এতলোকের জটলা দেখে সে রীতিমত ভীত হয়ে পড়েছিল এবং নিজের সমর্থনে কিছু না পেয়ে সামনে নিজের জাতির কথা তুলছিল যেন অপর যে কোনো জাতের লোক চোর হতে পারে, বরইরা হয় না কখনও।

নতুন লোক এখনও আসছে এবং ক্রোধে উত্তেজনায় দু চারটা মার দিয়ে ভিড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। কেউ গাছের সংগে বাঁধার এবং কেউ পুলিসের হাতে তুলে দেওয়ার পরামর্শ দিল। আমি তেমন কিছু পরামর্শ দিয়ে সরে পড়বার মতলবে ছিলাম, কিন্তু শিবনাথবাবুর মেজ ছেলে দৌড়ে এল এবং বাবাকে একদিকে নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে কিছু বলল।

কিছুক্ষণ পর শিবনাথবাবু যখন ফিরে এলেন, তার চেহারা ব্যস্ত বলে মনে হল। তিনি এক দুবার এদিক ওদিক এবং শেষে আমার দিকে তাকিয়ে সজোরে বলেন—'বেশ ছেড়ে দিচ্ছি। অনেক হয়ে গেছে ভবিষ্যতে এ সব করার সময় বেটা একটু চিন্তা করবে।'

লোকে এখন শিবনাথবাবুকে ভাল মন্দ বলতে বলতে আপন আপন রাস্তা নিলে। আমি শিবনাথবাবুর দিকে ঈষৎ হাসো তাকালে তিনি অপ্রস্তুতের মত আমার পাশে এসে বলেন—'এবার শাড়িটা বাড়িতেই পাওয়া গেছে, যাক। চোর-পকেটমাররা সারা রাত মার খেয়েও মুখটা খোলে না। ভবিষ্যতে মনে রাখবে।'

এবং তার কথায় আমি যখন অট্টহাসি করে উঠলাম, তিনি বাঁ চোখটি কায়দা করে টিপে এবং দাঁত বের করে হাসার চেষ্টা করলেন 'নিন, চলুন মশাই, নীচ এবং লেবুকে টিপলেই রস বের হয়।'

মাঝে মাঝে খুব আশ্চর্য লাগে এত

মার খাওয়ার পরও সেই ভিখিরীটা আমাদের পাড়ায় টিঁকে থাকতে পারল কি করে? আমি প্রায় এ সম্বন্ধে ভেবেছি কিন্তু কোন দিন নিশ্চিত উত্তর পাই নি।

যাই হোক, সে দিনের ঘটনার পরও ভিখিরীটি আমাদের পাড়ায় টিঁকে থাকল। তার প্রতি আমার কৌতূহলটা আরও বেড়ে গিয়েছিল। পড়ো বাড়িতে বসে কিছু খেতে বা চুপচাপ ঘুমাতে বা পাড়ায় এক এক পা করে হাঁটতে দেখতাম তাকে। কিছু লোকে তাকে বড় রকমের সাধু বা মহাত্মা ভেবে বসেছিল, কিন্তু ক্রমশ এ সমস্ত বাক্তি লঘু সংখ্যক হয়ে উঠল কারণ সেই ভিখিরীটা খাওয়ার জন্য শুয়োরের মত ঘুরে বেড়াত।

ক্রমশ সে পড়ো বাড়িটা ছেড়ে দিল এবং জন সাধারণের সহানুভূতি এবং বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে, যখন সে কারুর না কারুর উঠান কিম্বা দাওয়ায় বসা বা ঘুমনো শুরু করল, তখন লোকে ছোট খাট কাজের ফরমাইশও ওকে দিতে লাগল। গরিব দুঃখীদের প্রতি দয়ামায়ায় শিবনাথবাবুর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন তবু ও ভিখিরীটা যতদূর সম্ভব ওর দরজা মাড়াত না।

একদিন কোনো শুভ মুহূর্তে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ইশারা করে তাকে নিজের কছে ডাকলেন শিবনাথবাবু এবং তার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে ঈষৎ হাস্যে বললেন, 'শোন, তুই যাই করে থাকিস না কেন, কিন্তু আমি তোর এ অবস্থা দেখতে পারি না। আজ থেকে এদিক ওদিক আর তোকে বেড়াতে হবে না, আমার এখানেই আরামে থাকবি এবং দুবেলা পেট ভরে খাবি।'

শিবনাথবাবুর স্নেহ বন্ধনেই হোক কিম্বা ভয়েই হোক, ভিখিরীটা ওখানেই স্থায়ী হয়ে গেল। তাঁর এখানেই ওর নামকরণ সংস্কারটাও সমাপন হল। যদিও সে নিজের নাম গোপনে বলেছিল, কিন্তু যেহেতু শিবনাথবাবুর ঠাকুরদার নাম ও সে নাম একই বাড়ির মেয়েরা সংস্কারবশত তা উচ্চারণ করতে পারত না। তিনি তার নাম 'রজুওয়া' রেখে দিলেন এবং সে সেই নামেই পাড়ায় প্রসিদ্ধি পেল।

কিন্তু রজুওয়ার ভাগ্যে শিবনাথবাবুর এখানে বেশিদিন টিঁকে থাকা লেখা ছিল না। আসল কথা হচ্ছে পাড়ার লোকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। যখন ভগবান দয়াপরবশ হয়ে তাদের মাঝে একটি চাকর পাঠিয়ে দিয়েছেন, তখন সকলেরই তার উপর সমান অধিকার রয়েছে। অতএব তাঁরা সুযোগ বুঝে তাকে নিজেদের সেবার সুযোগ দিতে শুরু করলেন।

রজুওয়া শিবনাথবাবুকে এখনও ভয় করার জন্য অন্য কারুর কাজ লুকিয়ে করত। কিন্তু তাকে মারার অধিকার অন্যদেরও ছিল। একবার যমুনালালের ছেলে জগ্গী তাকে তিনচার আনার খড়ি আনতে বলেছিল এবং সে তাড়াতাড়ি আসবে বলে চলে গেয়েছিল। কিন্তু সে তাড়াতাড়ি আসতে পারল না, শিবনাথবাবুর বাড়ির মেয়েরাও ওকে যেই সেই কাজে আটকে রাখল। পরে যমুনালালের এখানে পৌঁছালে জগ্গী প্রথম কাজটি এই করল যে তার গালে দুটো চড় কষে দিল, 'শুয়োর, ধোঁকা দেওয়া শিখেছিস। বলে দিতে পারতিস, আসতে পারব না। আজ সারা দিন আমার এখানে খাটতে হবে,

দেখি, কোন শালায় আটকায়। আমরাও এই পাড়াতেই থাকি।'

এবং সত্যি সত্যি সে ওকে দিন ভর খাটালো। সব কিছুই জানতে পারলেন শিবনাথবাবু, কিন্তু তার উদার ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না, কারণ তিনি টু শব্দটি করেন নি।

এ রকম অনেক ঘটনা ঘটে গেল, কিন্তু রজুওয়ার উপর কারও স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল না। পাড়ার কেউ দু চার টাকা দিয়ে ওকে স্থায়ী রূপে চাকর রাখতে রাজী হল না, কারণ সে এতটা দায়িত্বশীল মোটেই ছিল না যে চব্বিশ ঘণ্টার চাকরের মহান দায়িত্ব পালন করতে পারত। এখন সে শিবনাথবাবুর ওখানেও থাকতে পারত না, কারণ কেউ ওকে স্থায়ীরূপে কারুর এখানে থাকতে দিত না। এটা রজুওয়াও বুঝতে পারত এবং পাড়ার লোকেও বর্তমানে ব্যক্তি বিশেষের নয়, রীতিমত সম্পূর্ণ পাড়ার চাকর হয়ে উঠল সে।

রজুওয়ার জন্যে ছোট-খাট কাজের অভাব ছিল না। কারুর এখানে খেয়ে নেয়ে বাইরে তক্তপোষে বা মাটিতে সে শুয়ে পড়ত এবং ভোরে উঠলে পাড়ার সকলে ওর অপেক্ষায় বসে থাকত।

ওকে কম পক্ষে এক আধ ঘণ্টা এবং বেশি হলে চার পাঁচ ঘণ্টা খাটিয়ে লোকে ইচ্ছানুসারে পারিশ্রমিক দিত। যদি কোন ছোট খাট কাজ হত তবে বাসি রুটি, ভাত বা ভাজা বুট বা ছাতু দেওয়া হত ওকে যা সে এক কোণায় বসে 'চাপুর-চুপুর' করে খেয়ে ফেলত। যদি কোন বড় কাজ হত তবে এক বেলার খাওয়া তাকে দেওয়া হত যাতে কিছু না কিছু বাসি থাকা অনিবার্য ছিল, কখনও কখনও ডাল ও তরকারি না থাকাও স্বাভাবিক ছিল। কখনও নূন ভাত খেয়ে এক ঘটি জল খেয়ে নিত সে। কখনও রুটি আচার বা কখনও কখনও খাওয়ার জন্য শুধু তরকারি বা ডাল ওকে পরিবেশন করা হত। কোনো দিনে খাওয়ার কিছু না থাকলে দু চারটা পয়সা পেত বা মোটা পুরনো চাল বা ডাল বা পাঁচ ছটা আলু তার বরাদ্দ ছিল। মাঝে মাঝে বাকিতেও কাজ চলত। সে কাজ করে দিত এবং তার পরিবর্তে ভবিষ্যতে ওকে কিছু দিয়ে দেওয়া হত।

এর মাঝে আমার বাড়িতেও ওর আগমন শুরু হল, কারণ বুদ্ধির ব্যাপারে আমার শ্রীমতি কারুর চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না। রজুওয়া আসত এবং কাজ করে চলে যেত। এক দু বার আমর সঙ্গেও তার চোখাচোখি হল কিন্তু আলাপ করি নি।

বুঝি কোনো ছুটির দিনেই হবে। বাড়ির বাইরে বসে কোনো গল্পের বই পড়ছিলাম। এতক্ষণে রজুওয়া ভেতর থেকে এসে কোণায় বসে পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকালাম।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম এবং আমার সেদিনের কথা মনে পড়ল যে দিন চুরির অপরাধে তাকে প্রহার করা হয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম—'কিরে রজুওয়া তোর বাড়ি কোথায়?'

ভাবাচাকা খেয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং মুখ বিকৃতি করে বলল—'হুজুর, রামপুর।'

'গ্রাম ছেড়ে এখানে চলে আসলে?' পুনরায় প্রশ্ন করলাম ওকে।

উত্তর খুঁজে না পেয়ে ক্ষণিকের জন্য চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে

থাকল, এবং তারপর বলল—'আগে রসড়ায় ছিলাম, হুজুর।'

'রামপুরে তোর কেউ আছে?' তার দিকে দু একবার ভাল করে তাকিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম।

'না হুজুর, বাবা এবং দুটি বোন ছিল, মারা গেছে।' সে পুনরায় দাঁত কটি বের করে হেসে ফেলল।

তার পরে আর প্রশ্ন করি নি। সাহস হল না। সে পরক্ষণেই ওখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং আমার মনেও একটা কিছু ঘুণার মত দেখা দিল।

'ইনকিলাব জিন্দাবাদ, মহাত্মা গাঁধি কী জয়।'

কয়েক মাস বাদে নিজের কামরায় বসে রজুওয়ার স্লোগান এবং হি-হি করে হাসার শব্দ শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম। তারপর শুনলাম আঙিনায় দাঁড়িয়ে সে বলছে—'মা, লবণ হবে, রামবলি মিসিরের এখান থেকে রুটি পাওয়া গেছে, ডাল তৈরি করব।'

আমার স্ত্রী রান্না ঘরে ব্যস্ত ছিল। কিছুক্ষণ পর লবণ দেওয়ার সময় সে জিজ্ঞেস করল—'রজুওয়া, সত্যি করে বলতো, কত দিন হয় তুই স্নান করিস নি?

'আমি খিচুড়ি দিয়ে স্নান করি, তাই না মা।' লবণ নেওয়ার সময় সে বলল এবং হাসতে হাসতে চলে গেল।

কামরায় বসে সব শুনছিলাম হয়ত আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সে অজ্ঞ ছিল, নৈলে ওভাবে কথাগুলি বলত না। কিন্তু ব্যাপারটি পরিষ্কার যে পাড়ায় সে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। খাওয়া পরার চিন্তা তার বিশেষ নেই। শুধু এইটুকুই নয়, পাড়ার লোকের কাছ থেকে সে ক্রমশ লাই পাচ্ছে। লোকে এখন তার সঙ্গে হাসি তামাশা করে, মার খাওয়ার ভয়টাও তার মন থেকে মুছে গেছে। অবশ্য এ কথাটি সত্য যে অবস্থা পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে সে কিছুটা বেয়াড়া হয়ে উঠছিল। তাই নিজের আগমনের সূচনা ঘোষণার জন্য সে রাজনীতিক স্লোগান দিয়েছিল, যেন বলতে চেয়েছিল আমি হাসি তামাশার পাত্র, লোকে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করুক, যাতে আমার মনের সাহস বেড়ে যায় আমি যেন আশ্বস্ত হই।

সন্ধ্যা বেলা অফিস থেকে ফেরার সময় জিউতরামের দোকানের কাছে রজুওয়ার স্বর শুনতে পেলাম। পাতিয়ার স্ত্রী বাসন মাজছিল এবং তার কাছে দাঁড়িয়ে রজুওয়া মুখ বিকৃত করে বলছিল—'সেলাম বৌদি, ভাল ত?' এটুকু বলে সে বিনা কারণে হি-হি করে হেসে উঠল।

পতিয়ার বৌ ঠোঁট বাঁকিয়ে উত্তর দিল—'দূর হ মুখপোড়া। ভাল মন্দ পোছার মুরদ দেখ। পালা, নৈলে কালো হাঁড়ি দিয়ে এমন মার দেব যে দু দণ্ডে সমস্ত বেহায়াপনা...' এস্থলে সে একটা বিশিষ্ট অশ্লীল বাক্যের ব্যবহার করেছিল।

এরপর এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। পাড়ার যত সব ছোট জাতের স্ত্রীদের সঙ্গে সে 'বৌদি' সম্বন্ধ পাতিয়ে বসল। তাদের দেখে সে ছোট খাট রসিকতাও করে বসত যার উত্তরে তাকে আশানুরূপ গালিগালাজও শুনতে হত,

এবং তখন সে গাধার মত চিঁচু চিঁচু করে উঠত।

কোন কাজে এদিক ওদিক গেলে, ভাবান্তর লক্ষ্য করে থাকবে। তাই তাদের মুখে রজুওয়ার সম্বোধনের ভাকটিও বদলে গেল। সে শুধু রজুওয়া নয়--

ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ে

রাস্তায় কোন মেয়েমানুষকে বাসন মাজতে, দরজায় বসা কিম্বা নিজের অন্য কাজে ব্যস্ত দেখে সে ওখানে পৌঁছে যেত এবং বেহায়ার মত কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করত এবং শেষে গালিগালাজ শুনে হেচকি দিতে দিতে চলে যেত। ক্রমশ সে এতটা লাই পেয়ে বসল, যে নীচু জাতের যে কোন যুবতী মেয়েমানুষকে দেখে তা সে চেনা অচেনা যাই হোক না কেন, দূর থেকে হেচকি দেওয়া শুরু করত।

আমার মত পাড়ার অন্যান্যরাও তার রজুওয়া শালা। যেন 'শালা' ব্যতিরেকে রজুওয়ার কোন অস্তিত্বই নেই। এতে রজুওয়া ও যে কম খুশি ছিল তা নয়, কারণ এখন তার জীবনের অনিশ্চয়তা কমে যাচ্ছে এবং হঠাৎ কোন সংকট দেখা দেওয়ার ভয় ও দূরীভূত হয়েছে।

লোকে ওকে ক্ষ্যাপানটা বাড়িয়ে দিল।

'এ্যা রজুওয়া শালা, বিয়ে করবি?' লোকে রসিকতা করে বলত। রজুওয়া তাদের কথায় হি-হি করে হেসে উঠত এবং অভ্যাসানুসারে মাথা উপরের দিকে ঝাঁকিয়ে মুখ দিয়ে হেচকির শব্দ বের

করত যা সাধারণত খুব বেশি তো জিনিস মেলে পরে হয়ে থাকে। এই সব অঙ্গ-ভঙ্গি করে সে সরে পড়ত। সে বুঝতে পেরেছিল যে লোকে ওকে দেখলে আনন্দ পায়।

সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরে একটু জলটল খেয়ে বেড়ানোর জন্য বের হওয়া আমার অভ্যাস। রেললাইন ধরে বাঁশ-ডিহের দিকে যাওয়াটা আমি পছন্দ করি।

পনের কুড়ি দিন পর একদিন স্টেশনের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। স্টেশনের গেট দিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে জি· আর· পি অফিসের দিকে পা বাড়ালাম। কিছু দূরে যাওয়ার পরই দেখতে পেলাম রজুওয়া ঐ দিকে যাচ্ছে। আশ্চর্য হই নি, কারণ শহরের অনেকেই পায়খানা করতে কটহর নালার দিকে গিয়ে থাকে এবং ওটা স্টেশনের প্রায় কাছেই। আমি ধীরে ধীরে হাঁটা শুরু করলাম। সামনের দিকে গেলে অবস্থা কিছুটা বোধগম্য হল।

থানার সামনে বেঞ্চে বসে দুজন সেপাই নিজেদের ভেতর হাসি তামাশা করছিল। তাদের অদূরেই একজন স্ত্রীলোক নগ্ন অবস্থায় বসে। স্ত্রীলোকটি আর কেউ নয়, একটি পাগলী, কয়েক দিন ধরে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওকে কয়েক দিন ধরে চৌরাস্তায় এবং সরযূর ধারে বসে থাকতে দেখেছি। বয়স— এই তিরিশের কাছাকাছি হবে, দেখতে নেহাৎ বিশ্রী, কালো এবং নোংরা।

রজুওয়া ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শঙ্কিত দৃষ্টিতে কখনও পুলিসের দিকে দেখছিল কখনও পাগলিটির দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছিল। সম্ভবত পুলিসের দৃষ্টি এ দিকে ছিল না।

বড় লজ্জা অনুভব করছিলাম, কিন্তু এত কাছে গিয়ে ফিরে যাওয়াটাও সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া আসল ঘটনাটি জানারও কৌতূহল ছিল। শূন্যে তাকিয়ে পা বাড়ালাম। কিন্তু শত চেষ্টা করা সত্ত্বেও দৃষ্টিটা ওদিকে না গিয়ে পারছিল না।

রজুওয়া পুলিসের অবহেলার সুযোগ নিয়ে এগিয়ে আসল এবং ঝুঁকে পড়ে আদরের সুরে বলল, 'ওগো পাগলী দেবী ভাত খাবে?'

এতক্ষণে পুলিসগুলোর ভেতর থেকে একজন উঁচু সুরে বলে উঠল। 'কোন ব্যাটা আছিস ওখানে, রাস্তা দেখ, নৈলে মেরে লম্বা করে দেব।'

রজুওয়া ওখানে থেকে একটু সরে গেল এবং হাসতে হাসতে বলল, 'হুজুর, আমি রজুওয়া।'

'পালা ব্যাটা, শকুনের মত এসে পড়েছিস।' সম্ভবত সেপাইটি বলছিল এবং কথাটি শুনে সকলে হাসিতে ফেটে পড়ল।

ওদের পার করে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলাম, তাই এর বেশি আর কিছু কানে পড়ল না। তাড়াতাড়ি করে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে এলাম।

কিন্তু ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয় নি। বাড়ি এসে আঙিনায় খাট পেতে আধ ঘন্টাও আরাম করি নি, আমার স্ত্রী দৌড়াতে দৌড়াতে এল এবং হেসে বলল— 'একটু তাড়াতাড়ি ওঠ না।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠলাম এবং এসে যে দৃশ্যটি দেখলাম তাতে হৃদয়ে এক সঙ্গেই আশ্চর্য, ঘৃণা এবং করুণার এমন ভাব উদ্রেক হল যে বলা কঠিন। রজুওয়া উলঙ্গ

পাগলীটির আগে আগে আসছে। পাগলীটি এদিক ওদিক তাকিয়ে থাকলে বা দাঁড়িয়ে পড়লে সে তার আঙুল ধরে নিয়ে আসছে এবং নিজে আবার এগিয়ে যাচ্ছে, তারপর পেছন ফিরে তার কানে কানে কিছু বলছে। এ ভাবেই সে পাগলীটিকে রাস্তার অন্য ধারের কোয়ার্টারগুলির ছাদের উপর নিয়ে গেল। এই কোয়ার্টারগুলো আমার আবার ঠিক সামনেই এবং লাগালাগি করে তৈরি করা। তাদের ছাদের সিঁড়িগুলোতে কোন দরজা ছিল না, তাই শীতের দিনে লোকে ওখানে রোদ পোহাতে এবং গরমের দিনে রাত্রি বেলা বথাটে এবং বাজে লোকেরা ওখানে ঘুমাত।

তখনই রজুওয়া নীচে নামল। একা—পাগলীটি তার সংগে ছিল না। উৎসুক্য বাড়ল, দেখি ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। আমরা ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলাম এবং রজুওয়া তাড়াতাড়ি স্টেশনের দিকে দৌড়াল এবং কিছুক্ষণেই ফিরে এল। হাতে তার একটি ঠোঙা। তা নিয়ে সে ছাদের উপর উঠে গেল বুঝতে পারলাম পাগলীটিকে খাওয়ানোর জন্য কিছু নিয়ে এসেছে।

এর পর দু দিন পর্যন্ত রজুয়াকে পাড়ায় দেখা গেল না। ঐ দিনের ঘটনার পর থেকে মনে তখনও উৎসুক্য উঁকি মারছে, তাই স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার, রজুয়াকে দেখছি না কেন? এখন এদিকে আসে না বুঝি?'

শ্রীমতী চমকে উত্তর দিল, 'আরে তুমি জান না? ওকে কেউ বিশ্রী ভাবে মেরেছে এবং বর্তমানে সে বরণের বৌর ওখানে পড়ে আছে।'

'কেন কি ব্যাপার?' উৎসুক্য ধরা না পড়ে এমন ভাবে আস্তে করে বললাম।

স্ত্রী মুচকি হেসে বলল, ওগো, সেই ব্যাপারটা, রজুওয়া ঐ পাগলীটিকে ছেড়ে নরসিংবাবুর ওখানে কাজ করতে গিয়েছিল। নরসিংবাবুর স্ত্রী বলছিল যে সে দিন সে বেশ গম্ভীর ছিল এবং থেকে থেকে হেচকি দেওয়া যে তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে ছিল, সেটাও সে দিন বন্ধ ছিল। কাজে ওর মন বসছিল না। সে এক কাজে হাত দিত এবং সেটা শেষ হতে না হতেই কোয়ার্টারের ছাদে গিয়ে পাগলীর খোঁজ নিয়ে আসত। নরসিংবাবুর স্ত্রী ওকে কিছু খেতে দিলে সে ওখানে না খেয়ে, খাওয়ারটা কাগজে মুড়ে সাথে নিয়ে গেল। রাত প্রায় এগারোটা হবে। রজুওয়া উপরে গিয়ে দেখল, পাগলীর পাশে অন্য কেউ শুয়ে আছে। রজুওয়া আপত্তি জানালে ঐ বথাটে লোকটা ওকে বেদম পিটিয়ে পাগলীটাকে সাথে নিয়ে অন্য কোন স্থানে চলে গেল।'

'তুমি কেমন করে জানতে পারলে এ সব?' মনটি অজানা ক্রোধে ভরে উঠল।

'বরণের বৌ বলছিল যে।' শ্রীমতী উত্তর দিল এবং অকারণে হেসে উঠল।

অনেক দিন গত হয়েছে। গরমের সংগে সংগে লু-এর প্রকোপও দেখা দিয়েছে। ছাদে মার খাওয়ার চার-পাঁচ দিন পর পাড়ায় এসে রজুওয়া আবার কাজ শুরু করে দিল। কিন্তু তার ভেতর এক ভীষণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। আগের মত সে আর মেয়ে মানুষকে দেখে তাদের সংগে হাসি তামাশা করে না বা হেচকি তোলে না।

'রজুওয়া আজকাল দাড়ি কাটে না কেন?' স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করি।

সে মুচকি হেসে উত্তর দিল, 'আজকাল

সে ভক্ত হয়ে উঠেছে। বরণের বউকে কুতোর সাজা দেওয়ার জন্য সে দাড়ি বাড়াচ্ছে এবং প্রত্যহ শনিচরি দেবীর উপর জল ঢালাও শুরু করেছে।'

'মানে?' কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না। স্ত্রী বলা শুরু করল, 'ব্যাপারটা কিছুই না। রজুওয়া গত কিছু মাস ধরে বরণের বউর ওখানে ঘুমাত। তার সঙ্গে পিসি সম্বন্ধও পাতিয়ে নিয়ে ছিল সে। রজুওয়া যা দু চার আনা রোজগার করত, সেটা তার কাছে জমা দিত। সে বলে এমন ভাবে নাকি তার দশ টাকা হয়ে যায়। একবার রজুওয়া নিজের টাকা চাইলে বরণের বউ অস্বীকার করে এবং বলে যে তার কাছে তার কানাকড়িও জমা নেই। রজুওয়া এতে এতটা ব্যথা পায় যে সে দাড়ি রাখা শুরু করে দেয়। সে বলে যে পর্যন্ত না বরণের বউর কুষ্ঠ হচ্ছে সে দাড়ি কাটবে না। এই জন্যই সে শনিচরী দেবীর মাথায় জল ঢালছে।

আমি কিছু বলিনি কিন্তু স্ত্রী একটু উদাস সুরে বলল, 'বর্তমানে ও জ্বরে ভুগছে। ওর বিশ্বাস বরণের বউ কিছু মন্ত্র-টন্ত্র করে দিয়েছে। সে বলে, 'শনিচারী হচ্ছে জাগ্রত দেবী। দেখ, একমাসের ভেতরে বরণের বউ পচে মরবে।'

তার রুচি ধর্মের দিকে বেড়ে গেছে এবং শনিচরী দেবীর মানত করতে করতে সে মস্ত একটা ভক্ত হয়ে উঠেছে। আমার বাড়ির সামনে রাস্তার অন্য দিকে একজন পণ্ডিতজী থাকেন। তাঁর এখানে এক্কা টাঙ্গাওয়ালা এবং গাড়িওয়ালাদের বেশ জটলা হয়। তারা পণ্ডিতজীর দোকান থেকে ছাতু নিয়ে খিদেটা শান্ত করে এবং নিমগাছতলায় বসে দুদণ্ড বিশ্রামের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতাও করে।

আমার শোয়ার দু চার মিনিট পরেই পণ্ডিতজীর দোকান থেকে একটা স্বর কানে এল, 'তা রজু ভগত ভাই, গোঁসাইজী (তুলসীদাস) এ সম্বন্ধে কি বলে গেছেন? মহাবীরজী সমুন্দরে লাফালে তাড়কা মহারানী কী বলে ওঠে?'

'শোন, শোন,' প্রশ্ন কর্তার জিজ্ঞাসার উত্তরে রজুওয়া (হয়ত লোকে ওকে ভগত বলা শুরু করেছে) তৎক্ষণাৎ এমন তেজে বলল যেন তার ভয় হয়েছিল যে সে দেরি করলে অন্য কেউ বলে ফেলবে, 'বজরঙ্গ-বলী বড় জবর ছিলেন। সমুন্দরে...বলে সে এক রূপকথা বলে গেল।

'তা রজু ভগত, গান্ধী মহাত্মা তো জেহল থেকে বেরিয়ে আসেন, না।' দ্বিতীয় কেউ জিজ্ঞেস করে।

রজুওয়া আরও উৎসাহের সঙ্গে বলে, 'শোন শোন, গান্ধী মহাত্মাকে যখন জেহলে বন্ধ করে দেয় তখন একদিন কি হয় জান? সব সেপাই পেয়াদা থাকা সত্ত্বেও গান্ধী মহাত্মা জেহল থেকে বেরিয়ে আসেন, দেখা যায় সকলের চোখ কাপড় দিয়ে বাঁধা। মহাত্মা সাত সমুন্দর পার হয়ে দিল্লী পৌছান, তখন সরকার গুলি চালায়। গুলি মহাত্মার বুকে লেগে একশোটা টুক-রায় ভেঙ্গে পড়ে এবং মহাত্মা গান্ধী আকা-শের দিকে উড়ে যান।'

এর পূর্বে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু সম্ব-ন্ধীয় এমন মজাদার গল্প শুনি নি, যদিও চার বছর গত হয়, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

রজুওয়ার শ্বশ্রু বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্মানুরাগ সম্বন্ধীয় সংবাদ ও

বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। নিম্ন শ্রেণীর লোকের কাছে তার পরিচিতি হচ্ছে 'রজু ভগত' বলে। ভদ্রলোকদের কেউ কেউ যে তাকে রসিকতা করে এ নামে সম্বোধন করত তা নয়। কিন্তু তাদের সামনে লজ্জা পেয়ে সে সেখান থেকে সরে পড়ত। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর লোকের ভেতরে এমন ধরনের কথাবার্তা বলত যার মৌলিকত্ব অস্বীকার করবার উপায় ছিল না। সাধারণত সে রামসীতার চর্চা করত, ভূত প্রেত 'বরণ ডিহের' মহত্বের উপর আলোকপাত করত এবং মন্ত্র মাদুলির সার্থকতা বোঝাত। তারা নানা প্রকারের শংকা প্রকট করত এবং রজুওয়া সব কিছুর সমাধান করত।

এত ধর্ম চর্চা, এবং শনিচরী দেবীর মাথায় জল ঢালা সত্বেও ওর মনোস্কামনা পূর্ণ হল না উপরন্তু সে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ল।

সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে সবে মাত্র ফিরেছি, স্ত্রী এসে চিন্তাতুর সুরে সংবাদ দিল, 'ওগো, জান না, রজুওয়ার কলেরা হয়েছে।'

'বেঁচে আছে না মরে গেছে?' এমিনতেই জিজ্ঞেস করলাম।

দুঃখ প্রকাশ করে আমার স্ত্রী বলল, 'কি বলব, আমার বুকটা ছটফট করছে। কখন থেকে সেই পড়ো বাড়িতে পড়ে আছে। লোকে বলছে ঘণ্টা আধঘণ্টার মধ্যে সে নাকি মরে যাবে।'

কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নি?

'কে ওর আপন জন রয়েছে যে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যাবে? শিবনাথবাবুর এখানে কাজ করত, বমি হওয়ার পর ওঁরা ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। পরে ও রামজী মিশিরের ওখানে গিয়ে পড়ল, কিন্তু লোকে যখন জানতে পারল, তখন সেখান থেকেও ওরা তাড়িয়ে দিল ওকে। তারপর সে আর কোথাও যায় নি ঐ পড়ো-বাড়ির গাছের নীচে গিয়ে পড়ে রইল।'

আমি ব্যঙ্গ করে বললাম, 'এখানে ডেকে নিয়ে আসলে না কেন?'

স্ত্রী আশা করতে পারে নি যে আমি এমন একটা প্রশ্ন করে বসব, তাই আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। শেষে রেগে গিয়ে বলল, 'আমি ওকে এখানে ডাকব? কি সব বলছ? ছেলেপুলের সংসার, ঈশ্বর না করুন, যদি তাদের কিছু হয়ে যায়?'

হেসে দাঁড়িয়ে পড়লাম, 'একটু দেখে আসি।' দরজার দিকে পা বাড়াবার সময় বললাম।

'তোমার দুটি পায়ে পড়ি ওকে স্পর্শ কর না যেন এবং দেখা মাত্র তাড়াতাড়ি চলে এস।' স্ত্রীর চোখে কাতর অনুরোধ।

পড়ো বাড়িতে পেঁছলে দেখতে পেলাম, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দু চার জন লোক ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'রজুওয়া?' কাছে গিয়ে ডাক দিলাম।

কিন্তু ডাকে সাড়া দেওয়ার মত অবস্থা তার ছিল না। গাছের নীচে একটা ময়লা গামছার উপরে সে শুয়ে আছে এবং সারা দেহ বমি এবং পায়খানায় কদর্য হয়ে উঠেছে। বুকের পাঁজরগুলো আরও স্পষ্ট হয়েছে, এবং চোখ ভেতরের দিকে সেঁদিয়েছে এবং গাল দুটোতে গর্ত হয়ে গেছে। শ্বাস ধীরে ধীরে তখনও পড়ছে।

কি করা উচিত কিছু ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। শিবনাথবাবু কখন যে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছেন বুঝতে পারলাম না। তিনি নিম্ন সুরে

নিজের মত ব্যক্ত করলেন, 'হি কান্ট সার-ভাইব—বাঁচতে পারে না।'

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালাম, শিবনাথবাবুর উপর তো রাগ হচ্ছিলই, নিজের উপরও কম বিরক্ত হই নি। কখনও ভাবছিলাম বাড়ি ফিরে যাই, যখন আর পাঁচ জন গা লাগাচ্ছে না তখন আমারই বা এত গরজ কিসের? কিন্তু চোখের সামনে এমন ভাবে একজনকে মরতেও দেখতে পারি না। কিন্তু তার চিকিৎসাও করান কি আমার পক্ষে সম্ভব? কিন্তু ওকে হাসপাতালে তো পাঠান যেতে পারে। বুদ্ধিটা মাথায় আসতেই বিরক্তিটা তৎক্ষণাৎ কেটে গেল এবং তাড়াতাড়ি হাসপাতালমুখোই হলাম।

হাসপাতালে পৌঁছে কর্তৃপক্ষকে সব কিছু বোঝালাম এবং তাদের মোটরগাড়িতে চেপে আমি নিজেও সে স্থানে এলাম। রজুওয়ার শ্বাস তখনও চলছিল। হাসপাতালের মেথর দুটো যারা গাড়ির সঙ্গেই এসেছিল ওকে টেনে গাড়িতে ওঠাল। গাড়িটা চলে গেলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম, যেন মাথা থেকে একটা মস্ত বড় বোঝা নেমে গেছে।

সকলেই একমত ছিল যে রজুওয়া বাঁচতে পারে না, কিন্তু আশ্চর্য সকলের ধারণা সত্ত্বেও সে মরে নি। অবশ্য একথা ঠিক যে হাসপাতালে পাঠাতে যদি আরও একটু বিলম্ব হত, তা হলে কালের গর্ভ থেকে ওকে টেনে বের করা সত্যই কঠিন হয়ে উঠত। হাসপাতালে চার পাঁচ দিন থাকার পর ওকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সে আমার বাড়িতে এল। যদিও আমার স্ত্রীর খুব খারাপ লেগেছিল ওর আগমনটা, কিন্তু আমি ওকে বলে দিয়েছিলাম যে দু চার দিন এখানে পড়ে থাকতে সে যেন দেয় এবং তারপর সে নিজেই অন্য স্থানে আসা যাওয়া বা কাজ করা শুরু করে দেবে।

এবং একদিন ওকে বাড়িতে দেখলাম না। জিজ্ঞেস করলে স্ত্রী বলল যে সে নিজের ইচ্ছায় কোথাও চলে গেছে।

সে কোথাও যায় নি পাড়াতেই ছিল। কিন্তু খুব কম দেখা যেত ওকে। দু একবার বাসায় পা টানতে টানতে হাঁটতে দেখেছিলাম। সম্ভবত পেটে কিছু দেওয়ার জন্য সে চেষ্টা করছে।

এবং একদিন আবার সেই পড়ো বাড়িতে বসে থাকতে দেখলাম ওকে।

শিবনাথবাবু নিজের দরজার সম্মুখস্থ সিঁড়িতে বসে গায়ে তেল মাখছিলেন। নমস্কার করার পর প্রশ্ন করলাম, 'রজুওয়া পড়ো বাড়িতে পড়ে আছে কেন, ওর আবার কলেরা হয়েছে না কি?'

শিবনাথবাবু রেগে উঠলেন, 'চুলোয় যাক মশাই, লোক কাঁহাতক পারে? এখন ব্যাটার চুলকানি হয়েছে। যেখানে যায় চুলকান শুরু করে দেয়। তায় আবার কাজও করতে পারে না।'

পাশের বাড়ির কালিকারাম স্বর্ণকারের পুত্র চন্দ্রদীপ নিজের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। রজুওয়া প্রসঙ্গ চলছে শুনে কাছে চলে এলেন এবং নিজের অমূল্য মতামত জারি করলেন, এ সব লোককে গুলি করে মেরে ফেলা উচিত। তারা মরবে এটা নিশ্চিত, তবে এমন ভাবে কষ্ট ভুগে মরার অর্থ কি? ওদের মৃত্যুকে সহজ করে দেওয়া উচিত। গান্ধীজী একটা বানরকে বিষ দিয়েছিলেন কি না?

মূর্খের মত হেসে তার দিকে তাকিয়ে

থাকলাম। শিবনাথবাবু আরও উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'মশাই আপনি আমার মুখের কথাটি কেড়ে নিলেন—আমিও এ কথা বলতে চাই। সরকারের উচিত এ সব দীন দরিদ্রদের ব্যবস্থা করা। তারা তো কিছু করবে না। গরিব দুঃখীরা ক্ষিদেয় মরলেও তাদের মনোবিকার হয় না। এ অবস্থায় আমরা কি করতে পারি—আমাদের সাধ্য সীমিত।'

কিছু না বলে চুপচাপ বাড়ি চলে আসলাম। এবার আর সাহস হল না যে গিয়ে দেখি বা কুশল সংবাদ নি।

বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি রজুওয়াকে বক টকনি তো?' সন্দেহ হয়েছিল যে আমার স্ত্রীই ওকে তাড়িয়ে দিয়ে থাকবে নৈলে ও আমাদের বাড়িতে আসে না কেন? কথাগুলি শুনে স্ত্রী একটু চকিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল এবং রেগে বলল, নৈলে কি করতাম, রোগ ডেকে নিয়ে আসতাম? সে কি আমার কোন আত্মীয় স্বজন?

চুপ করে থাকলাম। বলার কি বা আছে।

রজুওয়ার ভয়ঙ্কর চুলকানি হয়েছে, কিন্তু সে পড়োবাড়ি ছাড়েনি। ওর চেহারাটি হলুদ হয়ে উঠেছিল এবং হাত পা পুড়ে যাওয়া রসির মত পাক খাওয়া। বাইরে সে খুব কম বেরুতো এবং বেরুলে ওকে দেখে শিহরণ দেখা দিত শরীরে, যেন কোন নরকঙ্কাল চলছে।

আষাঢ়ের শুরু, এবং বর্ষার আগমন প্রচারের উদ্দেশ্যে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেছে। শনিবারের দিনে, সকাল আটটায় অফিসের কাজ নিয়ে বসে পড়লাম। কিন্তু কাজে মন লাগছিল না। টেবিলে কলমটি রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

কারুর আসার শব্দ কানে না পড়লে হয়ত ঘুমিয়েই পড়তাম। চোখ খুলে বাইরের দিকে তাকালাম। দেখলাম, বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি বার তের বছরের ছেলে ঘরে উঁকি দিচ্ছে। ছেলেটি ময়লা ধুতি পরে এবং তার দেহ নেহাৎ নোংরা।

সন্দেহ হল, কোন চোর টোর নয় তো? তাই ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলাম 'কে রে, কি চাস?'

ছেলেটি অসঙ্কোচে ঘরে এসে দাঁড়াল এবং বলল, 'সরকার, রজুওয়া মরে গেছে। তার জন্যই এসেছি।' শেষে হেসে উঠল।

'মরে গেল? কবে মরল? কোথায় মরল?' আশ্চর্য হা করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

ছেলেটি আবার হেসে বলল, 'হ্যাঁ হুজুর, মরে গেছে। মালিক, এই 'কারডে' ওর গাঁয়ে একখানা চিঠি লিখে দিন।'

ছেলেটির হাতে একখানা পোস্টকার্ড ছিল। তা নেওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলাম, 'কি কি লিখতে হবে এতে? ওর গাঁয়ের ঠিকানা কি?'

'মালিক, রামপুরের ভজন রাম বরইকে লিখতে হবে। লিখে দিন গোপাল মরে গেছে।'

'গোপাল'।

'আজ্ঞে, এইটেই যে ওর নাম।'

তাড়াতাড়ি পোস্টকার্ডটি লিখে ছেলেটির হাতে দিয়ে দিলাম।

সত্যি বলছি, রজুওয়ার মৃত্যু সংবাদে বেশ একটু শান্তি অনুভব করেছিলাম, যেন মাথার উপর থেকে একটা ভারি বোঝা

নেমে গেল। যখনই ওকে দেখেছি, মনটা বিশ্রী রকম ঘৃণায় ভরে উঠেছে এবং কখনও কখনও ভেবে কষ্টও পেয়েছি যে এই লোকটি ভিক্ষা না চাইতে হয় তার জন্য কত চেষ্টাই না করেছে। এবং ভিক্ষা করতে গেলেও ওকে দোষ দেওয়া যায় না। সে অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু সাফল্য লাভ করে নি। যেহেতু সে মরতে চায় নি, তাই জীবনকে জোঁকের মত সে আঁকড়ে ধরেছিল। কিন্তু মনে হয় জীবনই ওকে জোঁকের মত আঁকড়ে ধরেছিল, এবং ধীরে ধীরে তার রক্তের শেষ ফোঁটা পর্যন্ত সে শুষে নিয়েছে।

রজুওয়ার মৃত্যুর তিন চার দিন গত হয়েছে। সম্পূর্ণ পাড়ায় এই সংবাদটি সে দিনই ছড়িয়ে পড়ল, তা শুনে শিবনাথবাবু এবং চন্দ্রদীপ আমার কাছে হন্তদন্ত হয়ে এলেন। তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং শিবনাথবাবু এ পর্যন্ত বললেন যাই বলুন, লোকটি ছিল সৎ।

কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না।

রাত সাড়ে আটটা বারান্দায় বসে ছিলাম। আকাশ মেঘে ঢাকা এবং সম্পূর্ণ বাতাবরণ এত শান্ত যেন কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে।

ভেতরে যাওয়ার জন্য যেই উঠেছি, একটা ছায়া দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম। রজুওয়ার মত চেহারার একটা নর কঙ্কাল ক্রমশ এগিয়ে আসছে। যদি ভূত প্রেত বিশ্বাসী হতাম তবে চিৎকার দিয়ে উঠতাম, 'ভূত ভূত।'.

চোখ বিস্ফারিত করে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। নর কঙ্কাল খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে আছে।

সে আমার কাছে চলে এল এবং হয়ত আমার আশ্চর্য ভরা মুখ দেখে বলল, 'হুজুর, আমি মরি নি, বেঁচে আছি।' শেষে শুকনো ঠোঁটে সে হেসে উঠল।

'তা হলে ঐ ছেলেটি এসেছিল কেন?'

দাঁত বের করে সে বলল, 'হুজুর ঐ ছেলেটি গুদড়ি বাজারের বচন রামের ছেলে। আমিই ওকে পাঠিয়ে ছিলাম। ব্যাপারটা এই, আমার মাথায় একটা কাক বসে পড়েছিল। হুজুর, মাথায় কাক বসা বড় অশুভ ওতে মৃত্যু ভয় থাকে।'

'তা হলে গায়ে চিঠি লেখানোর অর্থ?' কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না।

সে বোঝায়, 'হুজুর এই মৃত্যু সংবাদটি কোন আত্মীয় স্বজনকে জানালে মৃত্যু ভয় দূর হয়ে যায়। ভজন রাম বরই আমার কাকা। হুজুর আর একখানা কারড রয়েছে, 'এটাতে লিখে দিন, যে গোপাল বেঁচে আছে, মরে নি।'

জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম, তুই আসলি না কেন, ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিলে। কিন্তু সবই যে ব্যর্থ হবে তা জানি। হয়ত সে ভেবে থাকবে ওর কথা কেউ বুঝতে পারবে না, পাগলামো ভেবে ওকে তাড়িয়ে দেবে।

পোস্টকার্ডটি নিয়ে ওর ইচ্ছানুসারে লিখে দিলাম।

কার্ডখানি ফিরিয়ে দেওয়ার সময় তার দিকে ভাল করে তাকালাম। দেখলাম, তার চেহারায় মৃত্যুর বীভৎস ছায়া নৃত্য করছে, এবং সে জীবনকে জোঁকের মত আঁকড়ে আছে কিন্তু জোঁক সে না জীবনটা? সে জীবনের রক্ত শুষছে না জীবন তার?—বুঝে উঠতে পারলাম না।

অনুবাদ : মহাবীর চাচান

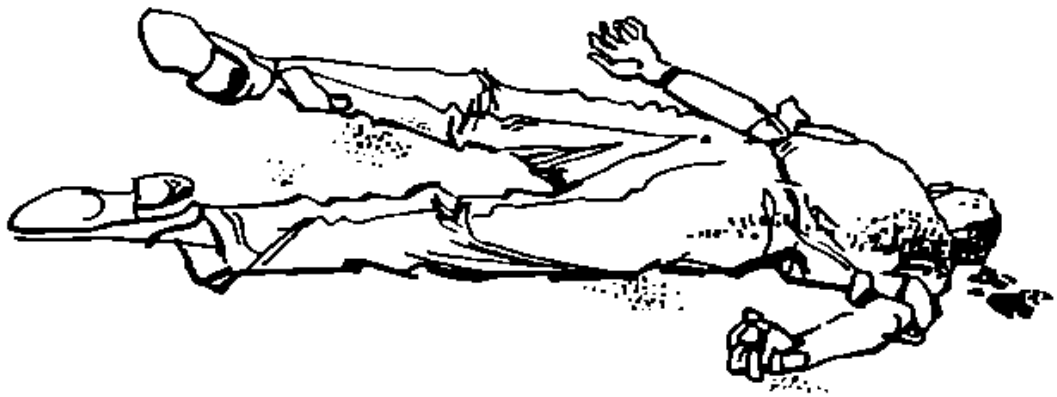

বেশ শীত। তখন প্রায় সন্ধ্যা ওমাহার মেথডিস্ট গির্জাতে এখনও প্রার্থনা শুরু হয়নি। এই গির্জার কাছেই, উইলিয়ম ম্যাকডোভিটের অসাড় দেহখানি পড়েছিল। সে যে মরেছে এটুকু চিহ্ন ছিল, বেচারার মাথায় একটি বুলেটের গর্ত।

বিশেষ পরীক্ষা করে দেখা গেল, যে ম্যাকডোভিটের মৃত্যু ·২২ ক্যালিবারের বন্দুকের বুলেট লেগেই হয়েছে, এবং তাকে যে খুব কাছে থেকেই মারা হয়েছে সে কথাও পরিষ্কার হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য বহুলোকই সেই সময় এই স্থানের কাছাকাছি জায়গায় ছিল, কেউ-ই বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজ পর্যন্ত শোনেনি। তাছাড়া, এটা যে ম্যাকডোভিটের সর্বস্ব হরণ করার জন্য হয়েছিল এমনও মনে হয় না, কারণ তার পকেটে মনিব্যাগ এবং ঘড়ি কেউ স্পর্শ করেনি।

পুলিস কিছুই ভেবে পেলে না, কোন সূত্রই নেই। শুধু একটিমাত্র সূত্র, যা অত্যন্ত নগণ্য তা হচ্ছে এই যে মৃতদেহের অনতিদূরে একটি বুলেটের খোল পাওয়া যায়। এই খোলটির একপাশে অদ্ভুত ঘষার দাগ এবং খোলটির শেষে ইউ অক্ষরের মত তোবড়ানো ঘওার দাগটি এক্সট্রাকটরের জন্যে আর তোবড়ান ব্যাপারটা 'ফায়ারিং পিন' পড়ার জন্যেই হয়েছিল।

খুনী সম্পর্কে অনেক কল্পনা-জল্পনা অনেক ভাবা সত্ত্বেও কোন সিদ্ধান্তে পৌছান গেল না। সমস্ত ব্যাপারের চেহারাটা দেখে, এইটুকুই মনে হল, মৃত ম্যাকডোভিটের সঙ্গে নিশ্চয় কোন না কোন

কারণবশত খুনীর শত্রুতা ছিল; আর একটা কারণও মনে হল, হয়ত কোন

ছেলের ভুলক্রমে ছোঁড়া বন্দুকের গুলিই ম্যাকডেভিটের মৃত্যুর কারণ হতে পারে—কারণ এ-অঞ্চল অনেক ছেলেরই ·২২ বন্দুক ছিল। পুলিস তন্নতন্ন করে খুঁজলে কিন্তু কোন হদিশ করতে পারলে না।

আশ্চর্য ঠিক পরদিন সোমবারে, ঠিক যেখানে ম্যাকডেভিট খুন হয়েছিল, তারই খানিক দূরে আর একজন যুবক রহস্যময়-ভাবে খুন হল, এ ক্ষেত্রেও ·২২ বুলেট। কোন আওয়াজ শোনা যায়নি। যুবকের মৃত্যু-খবর যাঁরা পুলিসকে এসে দেয় তারা সকলেই বলেছিল, তারা প্রত্যেকেই চোরা-বুলেটের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

যেখানে এ-কান্ড ঘটে, ঠিক তার কাছেই এক বাড়ির জানলা ভেদ করে খাবার ঘরের দেওয়ালে একটা বুলেট ঢুকেছিল, খুঁড়ে দেখা যায় সেই একই বুলেট। অবিকল সেই একই বুলেট, যে বুলেটে ম্যাকডেভিট মারা যায়। যারা এই চোরা বুলেটের হাত থেকে বেঁচে পুলিসকে খবর দিতে এসেছিল তারা প্রত্যেকেই একবাক্যে স্বীকার করেছিল কেউই সাধারণত বন্দুকের যে আওয়াজ হয়ে থাকে তা শোনেনি।

সোমবারের ঘটনার পর শহর চঞ্চল হয়ে উঠল, সকলেই ভয়ে নীল—গুজবের পর গুজব হাওয়ায় চলা-ফেরা করতে শুরু করল। সকলেই ধরে নিলে কোন উন্মাদ শব্দহীন রাইফেল দিয়ে শহর তচ্‌নচ্‌ করে একশা করবে। সাধারণ জনমানুষের ঠোঁট শুকনো, মনে আতঙ্ক।

অফিসার এবং অনেক শহরবাসী সমস্ত তল্লাটটা তন্নতন্ন করে খোঁজা শুরু করলে, কিন্তু কোন ফল হল না। এই সূত্রে, হাসপাতালগুলোয় খোঁজ নেওয়া হলো যে, কোন মস্তিষ্কবিকৃত লোক পালিয়েছে কিনা। পুলিস ব্যতিব্যস্ত নানারকম খবর আসতে লাগল ক্রমাগত, কে কোথায় একজন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে দেখেছে, কে কোথায় একজনকে রাস্তায় ঘুরতে দেখেছে, কে যেন গুলির শব্দ শুনেছে।

ঠিক এর পরদিন আবার! এই গুপ্ত-ঘাতক পুনরায় তার কাজ শুরু করলে। অনেক গুলি এলোপাতাড়ি ছুটে গেল, একজন ভদ্রমহিলা ঠিক এসময় এক ডাক্তার-খানায় বসেছিলেন—কি ভাগ্য তাঁর লাগেনি।—ঠিক তার পাশ দিয়ে বুলেট দেওয়ালে গেঁথে গিয়েছিল। সেই একই বুলেট। রাস্তায় একটি গাড়ির কাচও একটা বুলেট লেগে চুরমার হয়ে যায়।

আজ দিন-তিনেক ধরে ঠিক একই ব্যাপার, ঠিক একই অঞ্চলে ঘটে যেতে থাকল, এত বড় দুঃসাহসিক কাজ কেউ কল্পনায় আনতে পারেনি! পুলিস কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ম্যাকডেভিট যেখানে খুন হয়, ঠিক তার আশ-পাশেই এই তান্ডবলীলা হয়ে চলেছে, অথচ কেউ-ই বন্দুকের আওয়াজ পর্যন্ত পায় না, কেন টের পায় না, শুধু সাঁ সাঁ করে ভৌতিক বুলেটের আনাগোনা! কোন ছেনতাই, ডাকাতি নেই, ফলে সকলেই ভাবল ও কোন উন্মাদের কান্ড। হয়ত কোন যুদ্ধ-প্রত্যাগত বোমা-বিস্ফোরণ-আতঙ্কে ভুগছে, তার ফলে কোন কোন সময় তার খুনে রক্ত মাথায় চড়ে উঠে।

ঠিক ১৮ই ফেব্রুয়ারী আর এক কান্ড হল, ডক্টর অস্টিন সারলকে মৃত অবস্থায়, তাঁর অফিসে পাওয়া গেল। ঠিক মাথায় একটি বুলেটের গর্ত, অসাড় দেহের কাছেই বুলেটের খোল ঠিক যেমনটি ম্যাক-

ডেভিটের দেহের কাছে পাওয়া গিয়েছিল, তেমনি ঘষা তেমনি 'ইউ' মতন।

ডক্টর অস্টিনের অফিস সাধারণত আজ ক'দিন ধরে তাণ্ডবলীলার স্থান থেকে অনেক দূরে, বোঝা গেল পুলিস থাকে বলে 'ফ্যানটম কিলার' তার কর্মস্থান পরিবর্তন করেছে। ডক্টর অস্টিন সারল-এর অফিস থেকে অনেক কিছুই নেবার ছিল, কিন্তু হত্যাকারী কোন কিছুই স্পর্শ করেনি, শুধুমাত্র তাঁর ঘড়িটা দেখা গেল—নেই।

এতে করে সারা শহর আরও শঙ্কিত হয়ে উঠল, কি ব্যাপার তারা বুঝে পেলে না কারণ, সাধারণ ডাকাত হলে অনেকেরই হয়ত রক্ষা আছে—কিন্তু উন্মাদের হাত থেকে কে রক্ষা পাবে তা বলা বড় কঠিন! পুলিসরা হিমসিম খেয়ে গেল। ডিটেকটিভরা সারারাত্র জীবনপণ করেও কোন আশার- আলো দেখতে পেলে না।

নদীর ও-পাশে ওবাশ রেলওয়ে ইয়ার্ডের মধ্যে আর একবার নিঃশব্দ বুলেট ছোটাছুটি করলে।

রস ডব্লু জনস্টন, ওবাশ রেলওয়ে ইয়ার্ডের একজন স্পেসাল অফিসার: তখন সন্ধ্যে প্রায় উতরেছে, এমন সময় তিনি তদারকের কাজে ইয়ার্ডে ছিলেন, হঠাৎ স্তূপীকৃত সরঞ্জামের পাশ থেকে একটি ছায়া-মূর্তির উদয় হল, জনস্টন স্তম্ভিত। ছায়ামূর্তি এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করেই কি যেন উঁচিয়ে ধরল এবং সেখানে ক্ষণেক অগ্নি-উদ্গার দেখা গেল, কোন আওয়াজ নেই। জনস্টনের ঠিক কাঁধে এসে পর পর দুটি বুলেট লাগল। পরক্ষণেই ঠিক একটা এসে লাগল তার কনুয়ের কাছে। ছায়া-মূর্তির লক্ষ্য যে কি অভ্রান্ত তা এর থেকে বোঝা যায়। কেন না এ সময়ের মধ্যে জনস্টন কোনরকমে নিজের কোমরবন্ধ থেকে বন্দুক যেই তুলেছেন, অমনি কনুয়ের কাছে এসে বুলেট লাগে। এরপর জনস্টন চীৎকার করে তাঁর লোকজন ডাকতেই ছায়া-মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল।

জনস্টনকে হাসপাতালে আনা হল। জনস্টন যখন বেশ সুস্থ তখন সমস্ত ঘটনা বললেন, ছায়ামূর্তি বেশ দোহারা বেঁটে মত, মাথায় একটি কালো কাপড়ের টুপি, গায়ে চামড়ার ওয়েস্ট কোট। জনস্টনের গা থেকে বুলেট বার করে দেখা গেল, সেই একই বুলেট। পুলিস এইটুকু সন্ধান পেলে, ছায়ামূর্তির গায়ে চামড়ার ওয়েস্ট-কোট এবং তাকে দেখতে বেঁটে দোহারা।

এ-খবর চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়ল।

দু'দিন গেল, আজ ২২শে ফেব্রুয়ারী ওমাহা থেকে ত্রিশ মাইল দূরে আইওয়ার বারলেট বলে এক ছোট গ্রামে হঠাৎ এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল।

বারলেটের কাছ দিয়ে লাইন চলে গেছে, হঠাৎ সেখানের এক কুলি দেখল ঠিক একই পোশাক পরা, ঠিক বেঁটে খাটো দেখতে একজন লোক পায়ে হেঁটে চলেছে। সে কুলি সঙ্গে সঙ্গে তাদের ফোরম্যানকে খবরটা দৌড়ে এসে দিল।

ফোরম্যান এক-মুহূর্ত দেরী না করে একটা গাড়ি করে আরও জনাতিনেক লোক নিয়ে রহস্যজনক পথিকের সন্ধানে বার হয়ে পড়ল। অনেকখানি আসার পর তারা দেখতে পেলে, চামড়ার ওয়েস্ট-কোট পরা, মাথায় কালো টুপি পরা একজন লোক চলেছে। গাড়ি খানিকটা এগিয়ে গিয়ে, পথের বাইরে একটা খানামত জায়গায় নামিয়ে দেওয়ার পর ফোরম্যান এবং তার

সঙ্গীরা দূরে দূরে ঝোপ-ঝাড়ে লুকিয়ে রইল।

যেই মুহূর্তে রহস্যময় পথিকটি এদের কাছ বরাবর এসেছে অমনি চারজন একসঙ্গে বন্দুক তুলে তাকে থামতে বললে। পথিক হাত দুটি উপরে তুলে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে এরা এসে তাকে সার্চ করে তার কাছ থেকে একটি অটোমেটিক পিস্তল, এ পিস্তলে সাইলেন্সার পরান এবং একটি ঘড়ি পেলে।

চামড়ার ওয়েস্ট-কোর্টের মধ্যেই এই পিস্তলটা লোকটি রাখত, পিস্তলটি সাইলেন্সার পরানর জন্য একটু বেশি লম্বা। ফোরম্যান বেশ তৈরি হয়েই গিয়েছিল, সঙ্গে দড়ি নিয়েছিল, দড়ি দিয়ে লোকটিকে বেঁধে গাড়িতে উঠিয়ে বারলেটে নিয়ে এল।

বারলেট থেকে ওমাহার পুলিসকে খবর দেওয়া হল।

কিছু সময়ের মধ্যে পুলিস বাহিনী হাজির। সঙ্গে অনেক ডিটেক্‌টিভ। তারা এসে এই ভয়ঙ্কর হত্যাকারীকে তাদের ওমাহাতে নিয়ে গেল।

ওমাহাতে ইনস্‌পেক্টর তাকে প্রশ্ন করলে, সে নিজের ঘটনা বেশ সহজভাবে বলে গেল। তার বলার ধরনে সকলেরই মনে হল, লোকটি অতি সহজ সাধারণ, কোথাও মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ নেই।

'তার নাম, ফ্রাঙ্ক কারটার, বয়েস পঁয়তাল্লিশ' আরও বললে যে সে কান-সাসের অধিবাসী, এমন শান্ত কণ্ঠে সে সব কথা বলতে লাগল যে, তাতে করে সকলের মনে হল, এমন কোল্ড-ব্লাডেড খুনী আজ পর্যন্ত পুলিসের হাতে এসে কখনও পড়েনি।

ফ্রাংক কারটার বললে যে, ডক্টর অস্টিন সারল এবং ম্যাকডেভিটকে সে মেরে ছিল, কারণ তারা দুজনেই তাকে কোন শ্রদ্ধা দেখায় নি। মানে যখন সে তাদের রাহাজানি করতে গিয়েছিল—তখন তারা দুজনেই তাকে শ্রদ্ধা দেখায় নি। ফ্রাঙ্কের ধারণা, প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া উচিত, কি সে করছে তা তার দেখবার দরকার নেই—তার উচিত শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হওয়া। আমার ব্যবসাই হচ্ছে ডাকাতি, রাহাজানি করা, আমি যখন তাদের রাহাজানি করতে যাই তখন তারা অভদ্র-ভাবে কেটে পড়বার চেষ্টা করে—তাই আমি তাদের খুন করি' এরপর ফ্রাঙ্ক স্বীকার করেছিল যে, সে রস ডব্লু জনস্টনকে গুলি করে, এবং আরো অনেককে সে মেরেছে, তাও বলে। বলে যে আমি এ বন্দুকটা প্রায় বার পঞ্চাশেক ব্যবহার করেছি।

ফ্রাঙ্ককে পাগল বলতেই সে চটে উঠে বললে, কি আমায় পাগল বলা? তোমরা পাগল! আমি খুব ভাল করে জানি আমি কি করি, আমি রোজ ঠিক তিন ডলারের জন্য এ কাজ করি, তিন ডলার হলেই আর করি না।

পুলিসকে সে বললে, একদিন ওই জায়গায় গুলি ছোঁড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে পুলিস ওইখানেই নজর রাখবে, তাতে করে সে অন্য জায়গায় সহজেই রাহাজানি করতে পারবে।

বিচারের পর ফ্রাঙ্ক কারটারের মৃত্যু-দণ্ড দেয়া হয় ইলেক্‌ট্রিক চেয়ারে।

[ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ম্যাগাজিন

নিশ্চিহ্ন জনপদ

অমর রায়

পার্বত্য রেন্টনীর মধ্যে যাদের বাস বিপদ তাদের নিত্য সঙ্গী। বরফ ও তুষারের বিরাট বিরাট স্তূপ পর্বত গাত্রে সদাই আন্দোলিত। কখন বিপদ নেমে আসে তার ঠিক নেই। যখন এই বরফের স্তূপ মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে উপত্যকায় নেমে আসে তখন তাকে বলা হয় হিমবাহ। এই হিমবাহ ভয়াবহ গতিতে নিচে নামতে থাকে, কত শহর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সেজন্য মেরু প্রদেশের অধিবাসীরা যারা পার্বত্য প্রদেশের পাদভূমিতে বাস করে তখনই নিঃশঙ্ক জীবন যাপন করে না। জনবহুল আল্পস পর্বতের অধিবাসীদের জন্য বিপদজ্ঞাপক ঘন্টা স্থাপন করা আছে। হিমবাহ পতনের সম্ভাবনা দেখা দিলে সেই ঘন্টাধ্বনি সতর্ক করে দেয়। জনগন নিরাপদ দূরত্বে চলে যায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত জনবহুল পার্বত্য প্রদেশে এ রকম কোন ব্যবস্থা নেই। সেখানে মৃত্যু হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে মুহূর্তে হাজার হাজার লোকের প্রাণ নিয়ে চলে যায়। সম্প্রতি এমনি একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে পেরুর আন্দিজ পর্বতমালার অন্তর্গত হুয়েলাস উপত্যকায়। বাইশ হাজার দু'শো পাঁচ ফুট উঁচু হুয়াসকারন চূড়ার নিচেই হুয়েলাস উপত্যকা। গত ১০ই জানুয়ারী বিকাল দুটা তেরো মিনিটে নেমে আসে তুষার শৈল যার আয়তন হবে দুটো এম্পায়ার স্টেট বিলডিং-এর সমান। গতি ছিল ঘন্টায় পঁয়ষট্টি মাইল। এই বিরাট হিমবাহটি নেমে আসে হুয়েলাস উপত্যকায় অকস্মাৎ কোন রকম সংকেত না দিয়ে, চল্লিশ ফুট উঁচু কাদামাটির তরঙ্গ তুলে বারোটি জনপদ নিশ্চিহ্ন করে নিয়ে যায় পাঁচ মিনিটে। আর চার হাজার মানুষ বিলীন হয়ে যায় কাদামাটির সমাধিতে। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছিলেন পেরুবাসীদের যে হিমবাহ মাথার উপর মৃত্যুর খাঁড়া তুলেছে তা একদিন ওদের মাথায় নেমে আসবে। ওরা সে সতর্কবাণীতে কান দেয় নি। যার ফলে ঘটে গেল এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। রেড ক্রস প্রেরিত নেদারল্যান্ডের অনুসন্ধানী কুকুর খুঁজে ফিরেছে সেই কাদামাটির আবর্তে নিখোঁজ মৃতদেহ। কতগুলি খণ্ডিত

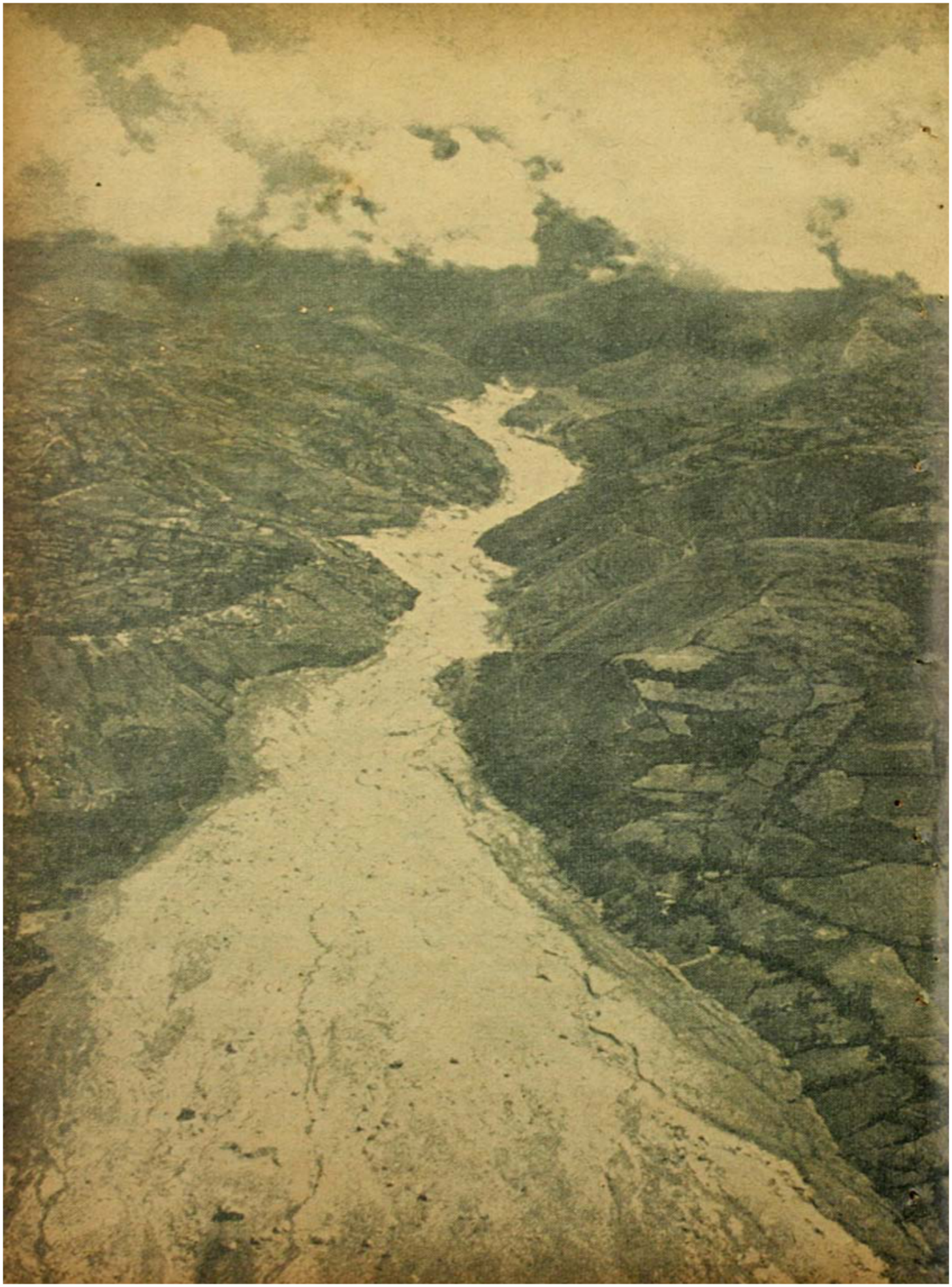

দেহের অংশ উদ্ধার করা গিয়েছে। কয়েকটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যাবে দুর্ঘটনার গুরুত্ব।

ডাক্তার লিয়নসিও গুজম্যান য়ুনগে হাসপাতালের চিকিৎসক। য়ুনগে হাসপাতালের কাছাকাছি হচ্ছে রানরাহির্কা যেখানে এই ঐতিহাসিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। ডাক্তার গুজম্যানের দুই ছেলে। তিনবছরের ভিক্টর এবং দুই বছরের এডওয়ার্ড। ওরা ওদের পিসির জন্মদিনে দাদুর বাড়ি রানরাহির্কায় গিয়েছিল আমোদ আহ্লাদ করতে গুজম্যানও রাত্রে গিয়ে ছেলেদের ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন এরকম কথা দিয়েছিলেন স্ত্রীকে। স্ত্রী দুই যমজ ছেলেকে নিয়ে য়ুনগেতে থাকেন।

ডাক্তার হাসপাতাল সংলগ্ন বাগানে বসে বন্ধুর সংগে কথা বলছিলেন। হাসপাতালের কাজ সেরে সন্ধ্যা নাগাদ রানরাহির্কায় যাবেন। রানরাহির্কা য়ুনগে থেকে ছয় মাইল পথ। গল্প করতে করতে হঠাৎ শুনতে পেলেন এক ভীষণ বিস্ফোরণের আওয়াজ। আকাশ যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ওর বন্ধুও চমকে তাকালেন পূর্ব আকাশের দিকে। সুউচ্চ হুয়াসকারানের চূড়ায় মেঘ যেন টগবগ করে ফুটছে। তার মধ্যে জ্বলছে সূর্যাস্তের শেষ শিখা। গুজম্যান বলেন, আমার তখন চিন্তা করার শক্তি লোপ পেয়েছে। আমি আমার দুই ছেলে আর বাবা বোনের কথা ভেবে পাগলের মত

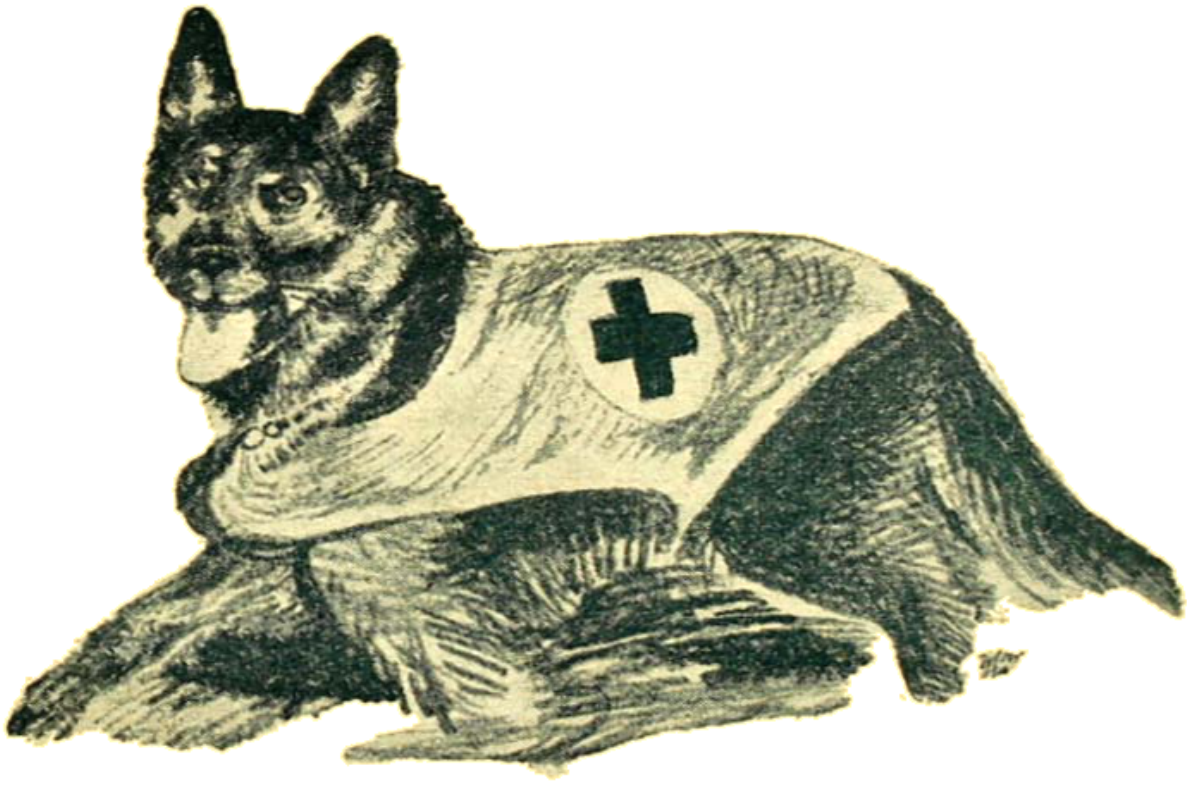

হয়েছি। ছুটে গিয়ে আমার গাড়িতে উঠলাম।

গাড়ি চলেছে উল্কাগতিতে। দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই ডাক্তার গুজম্যানের। গাড়ির গতি কত ছিল তা তিনি বলতে পারবেন না। একমাত্র চিন্তা কেমন করে ছেলেদের বাঁচবেন। বাবা, বোন রয়েছেন রানরাহির্কায়। দেরী হয়ে গেলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সমস্ত পরিবার। চেয়ে দেখলেন এক বিরাট কাদামাটির তরঙ্গ গড়াতে গড়াতে গাছপালার উপর দিয়ে ঘরবাড়ির উপর দিয়ে এগিয়ে আসছে বিদ্যুৎগতিতে। সেই তরঙ্গর দিকে পিছন ফিরে উন্মত্ত জনতা ছুটে পালাচ্ছে। বুঝলাম, যত জোরেই গাড়ি চালাই না কেন ওদের কাছে আর কোনদিন পৌঁছুতে পারব না। হঠাৎ দেখলাম পার হয়ে গেল হিমবাহ। গাড়ি থামিয়ে হিমবাহ যেখান দিয়ে অতিক্রম করে গেল সেখানে ছুটে গেলাম যেখানে একদা রানরাহির্কার অস্তিত্ব ছিল। যে রানরাহির্কা ফুলে ফুলে ভরে থাকতো, সে রানরাহির্কা আর নেই। আমি কত কাঁদলাম। অনেককেই দেখলাম কাঁদতে। আমার ছেলেদের নাম ধরে কত ডাকলাম বাবা বোনের নাম ধরে ডাকলাম কে দেবে সাড়া। নিজেকে ভীরু কাপুরুষ বলে ধিক্কার দিলাম। কেন লাফিয়ে পড়লাম না ঐ পঙ্ককুণ্ডে। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হল। বিকাল ছটা তেরো মিনিটে যার শুরু হল ছটা আঠারো মিনিটে তার শেষ। এই পাঁচ মিনিটে যে প্রলয় কান্ড ঘটে গেল তার অন্তিম ফল চার হাজার লোকের প্রাণ বলি।

আর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায় এই মারণ যজ্ঞের কাহিনী। ইনি হচ্ছেন রির্কাডো সিলভিও অলিডেরা। ইনিও ডাক্তারের বোনের জন্মদিনে অতিথি ছিলেন। ইনি রানরাহির্কায় ইলেক্ট্রিক প্ল্যান্টের অপারেটর। সন্ধ্যা আসন্ন হওয়ায় আর এক বন্ধু ওকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যাতে রানরাহির্কার আলোটা একটু আগে জ্বলে। অলিডেরা দ্রুত বেরিয়ে গেলেন ব্যাপারটা তদারক করতে। এই প্ল্যান্ট রানরাহির্কার প্রান্তে অবস্থিত। আলো জ্বালার ব্যবস্থা করে তিনি বাইরে এলেন দেখতে রানরাহির্কায় আলো জ্বলছে কিনা। বাইরে এসে দেখলেন লোকজন রাস্তা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে। অলিডেরা প্রথমে ভাবলেন কোথাও বুঝি আগুন লেগেছে। পরে তিনি নিঃসংশয় হলেন যে হিমবাহ নেমে আসছে হুয়েসকারান চূড়া থেকে। ধূসর মেঘের মত বিরাট একটা কিছু অসম্ভব গতিতে নেমে আসছে হুয়েলাস উপত্যকায়, যে উপত্যকায় রানরাহির্কার জনপদ। কেউ কেউ ছুটে গীর্জায় ঢুকছে। রেড ইন্ডিয়ান রমণীরা ঐ বিরাট স্তূপকে শান্ত করার জন্য হাত নেড়ে আবেদন জানাচ্ছে।

অলিডেরা পাগলের মত ছুটে চলেছেন রাস্তা দিয়ে বাড়ির উদ্দেশে। কোবাল্ট পাথরের উপর দিয়ে ছুটে চলা খুবই কঠিন। আমি আমার বাড়ির দিকে ছুটে চললাম বাতাসের গতিতে, কিন্তু পারলাম না। দৈত্যের মত পাহাড়টা আমার দিকে ছুটে এল। ঘর বাড়ি, মানুষ, জন্তু, জানোয়ার সব গ্রাস করতে করতে ছুটে আসছে অকল্পনীয় গতিতে আমি পালিয়ে এলাম পাওয়ার হাউসে। পথে দেখলাম ক্রন্দনরত জনতা। দু'টো

স্কুলের মেয়েকে জড়িয়ে ধরলাম ওদের বাঁচাবার জন্যে. কিন্তু ওরা বিদ্যুতের ছেঁড়া তারের সঙ্গে জড়িয়ে গেল, চেষ্টা করে মুক্ত করলাম ওদের কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না। একটা কাদামাটির ঢেউ ছিনিয়ে নিয়ে গেল আমার হাত থেকে আর আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল দূরে। তাদের রক্ষার জন্যে আবার ছুটলাম কিন্তু তারা তখন অতল তলে তলিয়ে গিছে চিরদিনের জন্যে। পাওয়ার হাউসে গিয়ে বন্ধ মটর আবার চালালাম, রানরাহির্কায় আলো জ্বলল শুধু যে কয়টি বাড়ি রক্ষা পেয়েছিল সেই কটিতে।

একদল লোক গল্পগুজব করছিল। এমন সময় তাদের মধ্যে একজন হুয়াসকারানের চূড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, এত ভয়ঙ্কর গর্জন কিসের। ওদের মধ্যে রামরেজ নামে একজন বার হিমবাহ সম্বন্ধে পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। হাতের ঘড়িটা দেখে নিল। তখন বিকাল ছটা তেরো মিনিট। তার মতে হিমবাহ নামতে প্রায় বিশ মিনিট সময় লাগবে। ওরা মনে করল অন্তত কুড়ি মিনিটের জন্য তারা নিরাপদ আছে। তাদের ধারণা ভ্রান্ত। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসে গেল হিমবাহ। কামানের গর্জনের মত ভীষণ গর্জন হল। রামরেজের বন্ধু মিজিয়া বললেন, আমার স্ত্রী ছুটে এলেন, বললেন শীঘ্রই এসো। ছেলেদের বাঁচতে হবে। আমি ছুটে গেলাম, বাড়ির দিকে, ছেলে দুটোকে বগলদাবা ক'রে ফিরে এলাম। এক পাশাপাশি পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম। আমার স্ত্রী হিস্টিরিয়া রুগীর মত কাঁপতে লাগলেন, সারারাত আমাদের চোখে ঘুম নেই।

পরের দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে দেখতে গেলাম গাঁয়ে কি হয়েছে। দেখলাম গাঁয়ের চিহ্ন নেই। কাদামাটির তলায় কত অগণিত মৃতদেহের কবর রচিত হয়েছে।

রানরাহির্কার নিকটবর্তী মোটাকোটা গ্রামের টেলিফোন অপারেটর হিলদা ইনফ্যান্টিস্ সুইচ বোর্ডে কাজ করছিলেন, সেই সময় শুনতে পেলেন—সেই বিস্ফোরণের আওয়াজ। সে তাকিয়ে দেখল হুয়াসকারানের চূড়ায়। সাদা মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। সঙ্গে সঙ্গে রানরাহির্কা টেলিফোন অপারেটর ম্যাগদা গুজম্যানকে ডায়েল করল। শিগগির পালাও! হিমবাহ নেমে আসছে হুয়াসাকরন চূড়া থেকে। ম্যাগদা প্রথম বিশ্বাস করে নি। সে মনে করেছিল হিলদা ওকে ঠাট্টা করছে। হিলদা দেখলো বিরাট বরফের স্তূপ নেমে আসছে ভয়াবহ গতিতে। হিলদা ভেঙ্গে পড়ল। চেঁচিয়ে উঠল, ম্যাগদা, নিজেকে রক্ষা করো এই মুহূর্তে। ম্যাগদা এবার বুঝল তামাশা নয়। কিন্তু কোথায় পালাবে। হিলদা আর শুনতে পেল না ম্যাগদার কথা। তখন রানরাহির্কার অস্তিত্ব মুছে দিয়ে গেছে হিমবাহ।

এরপর শুধু শোক যাত্রা। চার হাজার মৃতদেহের কটাই বা পাওয়া গেছে। শত শত কফিনের মধ্যে খণ্ডিত দেহের অংশ যা উদ্ধার করা গেছে তাই নিয়ে ওদের আত্মীয় স্বজন শবযাত্রায় চলছে পথ বেয়ে। ওরা অজস্র গোলাপফুল দিয়ে কফিনগুলো সাজিয়েছে। শোক সংগীত বাজছে, শুধু কান্নার সুর। ফুলের দেশ রানরাহির্কা আজ শুধু কাদামাটির সমাধি।

[লাইফ ইন্টারন্যাশনাল অবলম্বনে

ব্যক্তিত্ব বলতে সামাজিক নির্বন্ধের সঙ্গে

মানিয়ে চলার ক্ষমতাকে বোঝায়

ব্যক্তিত্ব

বিশ্বনাথ রায়

আমরা যখন কোনও ব্যক্তি চরিত্রকে বিচার করি তখন আমরা মানবিক ব্যবহারের কতকগুলি নিরূপিত দিককে ধরে নিয়ে, তাদের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিচরিত্রের মূল্যায়ন করি। এই নিরূপিত দিকগুলিই হচ্ছে ব্যক্তিত্ব গঠনের পক্ষে প্রধানতম সহায়ক। ব্যক্তিবিশেষের এই বিভিন্ন নিরূপিত দিকগুলি এবং তার কর্মক্ষমতার সংযোজনা বাহ্যিক ব্যবহারের মূল কারণ হয়। ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা সাধারণত সামাজিক ঘটনাবলীর প্রতি ব্যক্তিবিশেষের প্রতিক্রিয়া এবং বাহ্যিক জগতের সামাজিক নির্বন্ধগুলির সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতাকেই বুঝি। সুতরাং ব্যক্তিত্ব গঠন একটি সামাজিক ঘটনা এবং ব্যক্তিত্ব গঠনের সমস্যাটিও একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক সমস্যা।

মনোবিজ্ঞানীরা 'ব্যক্তিত্বলেখ' অথবা 'সাইকোগ্রাম' ব্যবহার করেন। এই ব্যক্তিত্ব লেখে সাধারণত যে সমস্ত মানসিক বিশেষত্বগুলি মাপা যায় সেইগুলির একটি তালিকা থাকে, যেমন, বুদ্ধ্যাঙ্ক (আই. কিউ) অথবা নানা রকমের অভিক্ষার (টেস্ট) ফলাফল। এই ব্যক্তিত্বলেখ থেকে আমরা একজন ব্যক্তির সম্বন্ধে একপ্রকার সমাক ধারণা করতে পারি। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বলেখ যত ভালভাবেই রচনা করা যাক্ না কেন, তবুও যেন মনে হয় ব্যক্তির মনের প্রকৃত ছবিটি পাওয়া যাচ্ছে না। কতকগুলি বিচিত্র স্বভাবের ঊর্ধ্বে গঠিত হয়ে থাকে তার মনোজগৎ। তার চিন্তা, তার স্মৃতি, তার ব্যবহারিক ভঙ্গী, সবগুলো মিলেমিশে এক এককের সৃষ্টি করে। একেই আমরা ব্যক্তিত্ব বলি। এই সব কয়টির প্রতিভূস্বরূপ সে নিজেকে 'আমি' বলে। 'আমি এটা চাই', 'আমি এটা ভালবাসি' বলতে সে সক্ষম হয়। এবং এই সবগুলিই তার ব্যক্তিত্বের এককের নিখুঁতভাবে এবং সমানভাবে গঠন করে। যখন কোনও ব্যক্তি বলেন 'আমার মনে হল এটা আমি করি কিন্তু কেন জানিনা পারলাম না করতে' তখন এই ভাবকে যদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, তার নীতিগুলি কায করেছিল এই বিশেষ ব্যক্তিত্ব গঠনের পেছনে যে মূল মানবিক বিষয়টি সেই মূলনীতিগুলির বিরোধী এবং সেইজন্য সেইকাজ করার ইচ্ছা হলেও সে কাজ সে করতে পারল না। যদি কোনও সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে এমন

কাজ করতে বলা হয়, যেটা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ এবং তার নীতিবিরুদ্ধ, তবে সেই কাজকে সে বলবে 'প্ররোচনা' (টেম্পটেশান্)। কিন্তু তাকে যদি এমন কাজ করতে হয় যেটা তার স্বভাবের স্বাভাবিক পর্যায়ের চেয়ে আরও উন্নত পর্যায়ের, এই প্রকারের কাজের উত্তেজনাকে তখন সে বলবে—'বিবেকের আহ্বান'।

গঠিত ব্যক্তিত্বের বন্ধন অনেক সময় ভেঙ্গে যায় এবং তার প্রমাণ হচ্ছে প্ররোচনার আধিপত্য। যে ব্যক্তিত্ব প্ররোচিত হয় সেই ব্যক্তিত্বের গঠন অসম্পূর্ণ। এবং প্ররোচনা 'দেহ-মন' বিশিষ্ট জীবের মধ্যেই উৎপন্ন হয়। এবং মানসিক বিকারগ্রস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে এই রকমের অবিনস্ত্য-ভাব এবং বহুরকমের ব্যক্তিত্ব দেখা যায়। একই দেহের মধ্যে মনে হয় যেন অনেক রকমের ব্যক্তিত্ব অধিষ্ঠিত। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব চরিত্র, নিজস্ব চিন্তা নিজস্ব স্মৃতি আছে বলে মনে হয়। ডাঃ মরটন প্রিন্সের বিখ্যাত রোগী মিস্ বিন ক্যাম্পের দুই-তিনটি ব্যক্তিত্ব ছিল। সেগুলি মাঝে মাঝে তাঁর অবচেতনায় প্রকাশ পেত। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই ব্যক্তিত্বগুলি গড়ে উঠেছে অসম্পূর্ণ অবস্থায় কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই স্মৃতি, সাধারণ চিন্তা ক্ষমতা প্রভৃতির অভাব ছিল না।

ফ্রয়েড মনে করেন যে, ব্যক্তিত্বে এই দেহের মূল কারণ স্বভাবের অবদমন (রিপ্রেশান্)। তিনি মনে করেন যে চেতন মনের অবদমনে অগ্রাহ্য কল্পনা বা চিন্তা ধ্বংস হয় না এবং অচেতন মনের অভ্যন্তরে তারা তাদের অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রাখে। এবং কালক্রমে এই টুকরো ঘটনাগুলি সন্নিবেশিত হয় বহুব্যক্তিত্বের গঠনকারী হয়ে ওঠে। এবং তার থেকেই ব্যক্তির বাহ্যিক ব্যবহারে ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়।

মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন ব্যক্তিত্ব গঠন হয় দুটো দিক থেকে: (১) সহজাত পরিক্রমায় (২) অর্জিত পরিক্রমায়। সহজাত পরিক্রমার মধ্যেও কয়েকটি ভাগ দেখা যায়: (ক) সহজাত দৈহিক গঠন (খ) স্নায়বিক গঠন এবং তৎপরতা (গ) দৈহিক বিশেষত্ব যেমন চলবার ভঙ্গী, দৈহিক শক্তি, সুন্দর অথবা কুৎসিৎ রং ইত্যাদি। অর্জিত পরিক্রমার মধ্যে পড়ে: (ক) স্বভাবের গঠন, কার্যাবলী ও বিশেষত্ব (খ) নিজের প্রতি এবং অপরের প্রতি ধারণা (গ) চরিত্র গঠন এবং সামাজিক মনোভাব।

ব্যক্তিত্বের মধ্যে সাধারণত পাঁচটি বিশিষ্ট জিনিস লক্ষ্য করা যায় যেমন, (ক) বুদ্ধিগত (ইনটেলিজেন্স)—এর মধ্যে পড়ে বোঝবার ক্ষমতা, চিন্তা করার ক্ষমতা, স্মৃতি, বিশেষ ক্ষমতা এবং সাধারণ মানিয়ে চলার ক্ষমতা। (খ) চলৎশক্তি (মোটিলিটি) কথাবলার ভঙ্গী, ধীরস্থির, প্রবণতা, প্রকার অথবা ভাব নিপুণতা। (গ) মেজাজ-গত (টেম্পারামেন্ট)—ভাবাবেগের অবস্থা, ভাবাবেগের বল, দীর্ঘসূত্রতা কিম্বা বীপ্সা। (ঘ) ব্যক্তিগত ব্যবহারগত (সেল্ফ--এক্সপ্রেশান্)—অন্তর্দৃষ্টি, দৈহিক প্রতিবন্ধকের জন্য ক্ষতিপূরণ, অন্তর্মুখিতা-বহির্মুখিতা, আত্মসমর্পণ—প্রভুত্বপ্রভাব ইত্যাদি। (ঙ) সামাজিকতাগত (সোসিয়ালিটি)—সামাজিক ব্যাপারে অংশগ্রহণ, সামাজিক চরিত্র গঠন, সামাজিক উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া এবং সংস্কারমূলক কাজে এগিয়ে যাওয়া।

বিংশ শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিক কিম্বা গণতান্ত্রিক সমাজগঠনের পটভূমিকায় ব্যক্তিত্বের গঠন সহজাত পরিক্রমার চেয়ে অর্জিত পরিক্রমার ওপর বেশি নির্ভর করে। কেননা সমাজ ব্যক্তিত্ব গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে শিক্ষা, খেলাধুলো, কর্মনিয়োগ অথবা সংস্থান প্রভৃতির মাধ্যমে। শিক্ষাকে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে এই কারণে যে, মনে করা হয় যারা শিক্ষিত অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী আছে তারা উন্নত পর্যায়ের। জার্মান সমাজ-বিজ্ঞানী কারসেন-স্টাইনের মতে 'সেই-ই প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি, যার দূরদৃষ্টি আছে, যে বিশেষ মতামতের দ্বারা প্রভাবিত হয় না কিম্বা যার শক্তি আছে।' যার দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ মতামতের দ্বারা রঞ্জিত তার চিন্তাশক্তি সীমাবদ্ধ এবং সংকীর্ণ। সে কারণ ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য রাজনৈতিক, ধর্মীয়, দার্শনিক মতামতগুলি তাদের নিজস্ব পন্থার কথা জানিয়ে যেমন ব্যক্তিত্ব গঠনের পক্ষে সাহায্য করে, তেমন-ই অনেক সময় ব্যক্তি চরিত্রকে কলুষিতও করে।

বিজ্ঞান-শিক্ষক আচ্ছা বলতো, তারকা কাকে বলে?

ছাত্র : সিনেমায় যারা অভিনয় করে স্যার!

ক্যামেরা

নীলিমা দাশগুপ্ত

ড্রইংরুমে ঢুকেই পাঞ্জাবের ডি· জি· মিস্টার বি· বি· রক্ষিত তীক্ষ্ন দৃষ্টি হানলেন ক্যামেরাটার দিকে। সেন্টার টেবিলের একেবারে সামনেই ক্যামেরা রয়েছে একটা।

'কৃপারাম—!'

'জী সাব্—' বয় কৃপারাম ছুটে এলো।

'এ ক্যামেরা এখানে কে রাখলে? কার ক্যামেরা এটা?'

কৃপারাম বিনীতভাবে জানালো, এক-জন নয়া সাব এসে রেখেছেন, তাকে সে চেনে না—

ইতিমধ্যে, মিসেস অনুপমা রক্ষিত এসে ঢুকলেন হাঁপাতে হাঁপাতে। সামনের সোফায় শরীর নিক্ষেপ করার মুহূর্তে ক্যামেরাটা দেখে ফেললেন।

'কার এটা?'

'আমারো তো সেই প্রশ্ন—' মিস্টার বিনয় ভূষণ রক্ষিত বললেন।

'কৃপারাম কী বলে?'

'চেনে না—'

অনুপমা সোফা ছেড়ে উঠে, ভুরু কুঁচকে ক্যামেরা হাতে নিয়ে দেখে হাঁক পাড়লেন, 'কৃপারাম!'

'জী মেমসাব্—' আবার ছুটে এলো কৃপারাম।

'যে সাব্ এসেছে, কী বলে গেছে সে?'

'কিছু বলেন নি—'

নাকের দুপাশে দুটো সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়লো মিসেস রক্ষিতের, 'বাক্স, বিছানা কিছু এনেছে নাকি?'

'জী হাঁ—' বাক্স-বিছানা কোথায় রেখেছে কৃপারাম তাও বলে দিল।

অনুপমার মুখের ওপর নিবিড় একরাশ কুয়াশা ঘনালো, স্বামীর দিকে তাকালেন, 'ক্যামেরাটা তো দেখলাম রোলিফ্লেক্স আমার মনে হচ্ছে, তোমাদের শুভময় এসেছে—'

'শুভু! গ্র্যান্ড—'আন্তরিক খুশির সুর বার হলো বিনয়ভূষণের গলা দিয়ে।

'—শুভু, গ্র্যান্ড—' বিদ্রূপের সুরে স্বামীর কথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন অনুপমা, 'তোমার আর কী, কোনো ঝামেলা তোমার তো পোয়াতে হয় না—যাকেই দেখবে, গলা বাড়িয়ে তাকেই নেমন্তন্ন করবে সিমলায় আসার জন্যে। পুজোর সময় এলেন যখন, তখন কী পুজো শেষ না করে যাবেন!'

'ও, সে তো আরো ভালো, কতদিন পরে শুভুর সঙ্গে দেখা! কী কাণ্ড দেখো, দিল্লীতে দশদিন থেকে এলাম, পথে, দোকানে কিম্বা রেস্তরাঁয় কিম্বা কারো বাড়িতে দেখা তো হতে পারতো শুভুর সঙ্গে—তা নয়। দেখা হলো কিনা স্টেশনে, আসার মুহূর্তে—'

'আসার মুহূর্তে কোথায়। ঘণ্টা দেড়েক ধরে তো গল্প করলে দুজনে। যাঁদের সী অফ্ করতে এলেন, তাঁদের তো ভুলেই গেলেন প্রায়—'

'কোথায় ভুলে গেলেন? স্টেশন থেকে রাজ্যের ফল মিষ্টি কিনে দিলেন না তাঁদের, ফটো তুললেন না তাঁদের—মজা দেখো, মানুষের স্বভাব কিন্তু বদলায় না। ক্যামেরা ঘাড়ে করে ঘোরা শুভুর সেই ছোটো বেলা থেকে অভ্যেস, বক্স ক্যামেরা নিয়ে ঘুরত, আর এখন রোলিফ্লেক্স'—কথা শেষ করে বিনয়ভূষণ হো-হো করে হেসে উঠলেন।

'থামো, তোমার ঐ বুনো হাসি শুনলে আমার শরীর জ্বালা করে,—কাউকে পেলেই হলো তোমার—'

'কাউকে কী বলছো! শুভু আমার নিজের জ্যাঠতুতো ভাই, তাছাড়া আমরা দুজনে একেবারে একবয়েসী—, আমাদের দু'ভায়ের মধ্যে ভাব যা ছিলো: শুভু বিলেত থেকে ফিরে দিল্লীতে পোস্টেড হয়েছে প্রায় তিনমাস হলো, অথচ সে সংবাদটাই আমি জানিনে। কী আফ্-শোসের কথা ভাবো, আজকাল পৃথিবীটা হয়েছে এমনি—কেউ কারো—'

'আফ্শোস পরে করো—' স্বামীর কথা রূঢ় গলায় কেড়ে নিলেন অনুপমা, 'ভদ্র-লোককে এখন খেতে দেবে কী? বাবুর্চিকে তো ছুটি দেয়া হয়েছে আজ, রাত্রি সাড়ে ন'টা বেজে গেছে—' বিনয়ভূষণ বসেছিলেন, ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়া-লেন, 'তাইতো? শিগ্গির কিচেনে যাও তুমি। ভাল-মন্দ বানিয়ে ফেলো কিছু, শুভু আবার বেশ ভোজন রসিক।'

'তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি কিচেনে ঢোকো—,আমি পারবো না—' অনুপমার কাঠ কাঠ জবাব।

'তার মানে?' বিনয়ভূষণের কপালে বিরক্তির আঁচড় পড়লো কয়েকটা।

'মানে বোঝার অসুবিধে কোথায়?'—অনুপমা ঠোঁট উল্টোলেন, 'মোট কথা, এই ভরপেট ডিনার খেয়ে এসে কিচেনে আমি ঢুকতে পারবো না।'

বিনয়ভূষণের ঠোঁটের ওপর দাঁতের কঠিন চাপ পড়লো। মেজাজী-মেজাজের বল্গা আর যেন টেনে রাখা গেলো না। উষ্ণ গলায় বললেন, 'নিজের বাপের বাড়ির কেউ এলে তখন তো এক পায়ে খাড়া। এই

যে 'মতে এসে দেড়মাস সব থেকে গেলেন তোমার বাপের বাড়ির দিক থেকে,—সম্পর্ক ধরতে গেলে তো আর বলতে হবে

তাকালেন, 'আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, খবরদার বাপ-মা তুলে কথা বলবে না—, গোঁয়ারের বুদ্ধি আর কত হবে—আর,

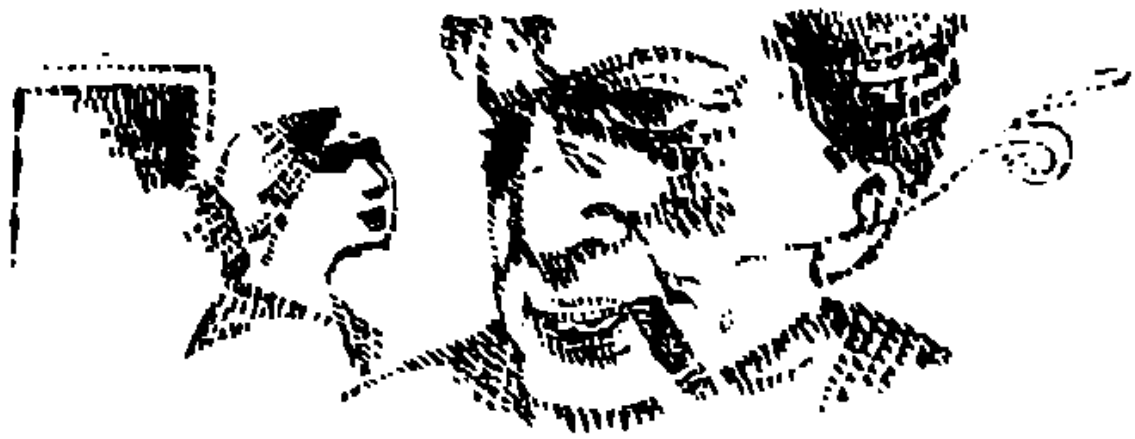

কপাল এমনি এমনি ফেরে না

না—মামার ক্ষেতে বিয়োলো গাই, সেই সম্পর্কে মামাতো ভাই'—

'নুইসেন্স! গোঁয়ো ছড়া আওড়াতে লজ্জা করে না তোমার—' অনুপমা মুখ ঝামটে উঠলেন।

'না, লজ্জা করে না—'গাম্ভীর্যে স্পষ্ট হলেন বিনয়ভূষণ, 'আমি তোমার মতো মেমসাব হতে পারিনি এখনো,—হরিসাধন স্কুল-মাস্টারের মেয়ে আম্রাকালি, অনুপমা হয়ে এমনিই বনে গেছেন যে কিচেনের চৌকাঠ ডিঙোতে পারেন না—'

'কথা বলার ছিরি দেখো—,ডিস্‌গ্রেস-ফুল—'অনুপমার গলায় একপশলা তপ্ত বিদ্রূপ ঝরল, দুহাতে কোলে রেখে টান হয়ে বসলেন অনুপমা, স্বামীর দিকে সরু চোখে

তাছাড়া ছিলে তো কেরানী, নেহাৎ পার্টি-শনের দৌলতে স্টাফের অভাবে কপাল ফিরলো—'

বিনয়ভূষণের কপালের দুপাশের শিরা কাঁপতে লাগলো।

'কপাল এমনি এমনি ফেরে না—' সিগারটা দাঁতে পিষে দিলেন, 'কাজ দেখিয়ে ফেরে—। তোমাদের কাজ তো ফোঁপরদালালি শুধু: এদিক সেদিক ওয়েল-ফেয়ারের সব কাজ করে বেড়াচ্ছেন, এদিকে ঘরে—'

এক ঝট্‌কায় উঠে দাঁড়ালেন অনুপমা, দৃষ্টির ঘায়ে বিনয়ভূষণকে ছেটে ফেলে দিয়ে, পা দাপিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গিয়ে

জিততে চাইলেন তিনি। বিনয়ভূষণ সারা শরীরে মৃদু একটা যন্ত্রণা অনুভব করলেন। প্রায় নিঃশব্দে একটা নিশ্বাস উঠে এলো বুক ঠেলে।—শুধু কথার উত্তাপেই তাঁর জীবন কাটলো, হৃদয়ের নয়—। শক্তির তাপে ভাস্কর বিনয়ভূষণ, জীবনের যে নক্‌শা ছোটোবেলা থেকে এঁকেছেন, যা জীবনকে সুখী করে, সুন্দর করে, প্রচুর অর্থ উপার্জন করেও সে সুখের স্বাদ কোনোদিনও পেলেন না তিনি। সে নক্‌শা কুচি-কুচি হয়ে ছিঁড়ে গেলো। একান্ত অসহায় বোধ করার মুহূর্তে মেয়ের কথা মনে পড়ে গেলো তাঁর।

বন্ধুর বার্থ-ডে পার্টি সেরে মিণ্টুর তো এতক্ষণ ফেরার কথা—! ছোটোবেলা থেকে মেয়েটা প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হয়েছে, অথচ হয়েছে কেমন অন্যরকম। শান্ত, গম্ভীর, মমতাময়ী—ঠিক যেন ওঁর মা মহামায়ার মতো।

'মিণ্টু—!'

কৃপারাম ঢুকলো, 'জী, মিস্‌সাব ঘরে নেই, নয়া সাবের সাথে বেরিয়েছে—'

'নয়া সাবের সাথে?—' বিনয়ভূষণ একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, 'নতুন সাহেব যিনি এসেছেন, তাঁর চেহারা কেমন?'

'সুরৎ খুব আচ্ছা আর রং ঠিক আস্‌লি সাহেবের মতো—'

সসম্ভ্রমে জানালো কৃপারাম।

'উঁহু—তবে তো—'

কৃপারামের মন্তব্য পাশের ঘর থেকে অনুপমা শুনে ফেলেছেন। হয়তো সজাগ রেখেছিলেন কানকে। ঘরে ঢুকে বললেন; 'সাহেবের মতো রং যখন তখন তো শুভময় হতেই পারে না—' অন্তরের ব্যাকুলতা কমে যাওয়ায় বিনয়ভূষণ আরাম বোধ করলেন। ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে দেখে যথাস্থানে রেখে বললেন, 'তোমাদের বীরেন বোধ হয়। কাশ্মীর থেকে ফেরার পথে সিমলা বেড়িয়ে যাবে লিখেছিলো না তোমাকে, তার তো একটা রোলিফ্লেক্স আছে আর তার রংও খুব ফর্সা।'

'হ্যাঁ বীরুই। আমারো তাই মনে এসেছে, বুঝলে—' খুশি উপচে-পড়া কণ্ঠস্বর অনুপমার।

বিনয়ভূষণ নীরব। মুখের চেহারা নির্লিপ্ত।

'এত রাতে বীরেনকে কী খেতে দি বলতো? ও আবার মাংস যা ভালবাসে—'

বিনয়ভূষণ চুপ।

'কৃপারাম—!'

কৃপারাম ছুটে এলো।

দেখো তো ফ্রীজে মাংস আছে নাকি?'

কৃপরাম দ্রুত পায়ে গিয়ে আবার সেই পায়ে ফিরে এলো, জানালো,—ফ্রীজে মাংস নেই।

'তবে কী হবে?'

স্বামীর দিকে তাকালেন অনুপমা।

বিনয়ভূষণ আয়েস করে সিগার টানছেন সোফায় পিঠ ছেড়ে দিয়ে।

স্বামীর ভঙ্গি দেখে অনুপমা চিড়বিড়িয়ে উঠলেন। সোফার হাতলে কনুইর চাপ দিয়ে, ভ্রুকুটি করে বললেন, 'একেবারে চুপ মেরে গেলে যে, ব্যাপার কী? তোমার জ্যাঠতুতো ভাইয়ের নামে তো লাফালাফি লাগিয়েছিলে, আর বীরেন আমার নিজের মাসতুতো ভাই, ভুলে যেও না—'

বিনয়ভূষণ নির্বিকার।

'—বাবুর্চিটাকে লাই দিয়ে এমন মাথায় তুলেছো, মাংস ফুরিয়ে গেছে, সে কথা আমাকে বলবে তো?—'

বিনয়ভূষণ অলস চোখে একবার তাকালেন শুধু। আঙুল ঠুকে সিগারের ছাই ঝাড়তে লাগলেন।

অনুপমা তপ্ত হতে তপ্ততর।

'আমার প্রেস্টিজ খাটো হবে বোঝো না তুমি?'

'প্রেস্টিজ কারো একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, ওটি সকলের—'

পায়ের ওপর পা তুলে, নির্লিপ্ত উত্তর দিলেন বিনয়ভূষণ। খুব শান্তভাবে পাশ কাটাতে চাইলেন এ প্রসঙ্গ।

অনুপমার স্বভাবে আপস লেখা নেই। তবু তিনি কণ্ঠস্বরকে এবার যথাসাধ্য খাদে নামালেন। একটু মিনতিরও সুর আছে তাতে। 'একটা পরামর্শ দেবে তো?'

একটু চুপ। তারপর বিনয়ভূষণ বললেন, 'ঘরে মাংস না থাকে, চাল ডাল তো আছে, খিচুড়ি বানাও না—আর ডিমের বড়া কী মামলেট—'

'খিচুড়ি? তার মানে লাপসি?—' অনুপমা জিভের ডগাটা ছুঁচোলো করলেন, 'ও চীজ মুখে উঠবে না বাবুর—'

'মার হাতের ভুনো খিচুড়ি খাওনি? চাল ডাল দিয়েই তো তৈরি হয়—' উদ্গত কথাটা আর চাপা দিতে পারলেন না বিনয়ভূষণ, 'তুমি পারবে না সে জিনিস, মিণ্টু আসুক বানিয়ে দেবে পাঁচ মিনিটে—'

আঁচড় যেটুকু পড়বার ঠিকই পড়লো। এত বড় খোঁটা হজম করবার পাত্রী অনুপমা নন। স্বরগ্রাম চড়ে গেলো আবার হু হু করে গনগনে গলায় বললেন, 'কথায় কথায় মা'র রান্নার তুলনা যে দাও, তোমার মা আমার মতো ইংলিশ রান্না পারবেন?' এক মহূর্ত বিরতি। 'আমার নিজের রুচি মতো মেয়েটাকে কিছু কী শেখাতে পারলাম, প্রতি শীতেই ধিং ধিং করে ঠাকুরমার কাছে যাচ্ছেন, কোথায় সেই লম্বা ছুটিতে আমার কাছে থেকে উলবোনা আর ইংলিশ-রান্না শিখবে, তা না খিচুড়ি শিখেছেন মেয়ে, প্যাটিসাপটা শিখেছেন, গোকুলপিঠে শিখছেন, তালের বড়া শিখছেন..., হাউ কুইয়ার...বলিহারি মেয়ের রুচিকে—' দু-তিন মুহূর্ত বিরতি, তারপর বললেন, 'আর তোমার মা নাতনীকে রান্না শিখিয়েই যদি ক্ষান্ত হতেন, তবু একটা কথা ছিলো, মিণ্টুর মনের গড়ন পর্যন্ত পাল্টে দিয়েছেন একেবারে। না হলে একজন প্রফেসারকে পছন্দ করে মিণ্টু? কলেজের মাস্টার আর স্কুলের মাস্টার, এপিঠ-ওপিঠ, মাস্টারদের দৌড় আমার জানা আছে সব—' রাশি রাশি ঘৃণা ঝরলো অনুপমার গলা দিয়ে।

বিনয়ভূষণ জোর করে ঠোঁট চেপে রাখলেন। 'আই· এ· এস, সমর কত ঘোরাঘুরি করলো মিণ্টুর পেছনে, ক্যাপ্টেন অজয় মিণ্টুর খাতিরে কতবার 'ডেভিকো'তে ডিনার দিলো, তা মেয়েটার এমন পান্সে রুচি গড়ে দিয়েছেন তোমার মা, পেটি রণেনকেই তার পছন্দ...আমার সব ইচ্ছে ভেস্তে দিলেন তোমার মা—'

মায়ের উল্লেখ করলেই দুর্বল হয়ে পড়েন বিনয়ভূষণ। স্থান-কালের সীমা-সংগতি স্মরণ করে, দাউ-দাউ করে রোষটাকে কোনো মতে যেন মস্ত লোহার ঢোপ্ দিয়ে ঢাকলেন। ধূসর স্বরে বললেন, 'রণেনকে মা ছোটবেলা থেকে চেনেন। মা বুঝেছেন, রণেনের হাতে পড়লে মিণ্টু সুখী হবে, তাই··তা'ছাড়া রণেন বিদ্যায় কুলীন, রূপে কুলীন, আর

রণেন এখন আবার পেটি কোথায়, ইংরিজীতে অক্সফোর্ডের পি. এইচ-ডি. নিয়েছে,...দিল্লী ইউনিভার্সিটি সসম্মানে আহ্বান করেছে রণেনকে...'

'তাই নাকি—?' অনুপমার কণ্ঠস্বর মোলায়েম,—'আমি জানিনে তো কিছু?...'

এদিকে, সিঁড়িতে দোতলায় ওঠার কয়েক ধাপ নিচে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে দুটি মানুষ। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। সিঁড়ির শেষেই প্রায় ড্রয়িং-রুমের ভেতরের কথাগুলি ওরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। মেয়েটির ডান হাত মুঠিতে জোর করে চেপে ধরে আছে ছেলেটি। যেতে দিচ্ছে না। আর মাঝে মাঝে সকৌতুকে মিষ্টি মিষ্টি দৃষ্টি বিনিময় করে দুষ্টু দুষ্টু হাসছে। মেয়েটির মুখের চেহারা শুধু বেচারি নয়, বিড়ম্বিত। ঘরের অপ্রীতিকর আলোচনার প্রতিক্রিয়া তার সমস্ত চোখে-মুখে দৃশ্যমান।

কথার ঝড় থামলো। একটু সময় দিলো ছেলেটি, তারপর মেয়েটির কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'চলো, যাই এবার—'

'দাঁড়াও,—' মেয়েটির গলার স্বর অস্ফুট, কুণ্ঠিত।

'কেন, কী হয়েছে?' বিস্তৃত রেখায় হাসলো ছেলেটি। মুঠিতে ধরা ভীরু হাতখানিতে হৃদয়ের উত্তাপ দিলো, হাতের মুঠি ঢিলে করলো, 'চলো—' জোয়ারের কল্লোল ছেলেটির কণ্ঠস্বর।

চোখের দৃষ্টিটা দীর্ঘ করে ছেলেটির মুখের ওপর রাখলো মেয়েটি। সে মুখের উদ্ভাসিত আলোয় সব গ্লানি কেটে গেলো তার। 'চলো—' এতক্ষণ পর মেয়েটি সহজ, সহাস্য।

'মা, বাবা—!' যেন বীণার তারে মধুর একটি সুর উঠলো। ভারি পর্দা সরিয়ে, থিতোনো নীরবতা হটিয়ে, হাসি হাসি মুখে ড্রইংরুমে ঢুকলো মিষ্টু পেছনে ছেলেটি।

ঘরের ভেতর সোফায় বসা মানুষ দুটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো বসেছিলেন। যেন অন্ধকার অবচেতনা থেকে চেতনায় ফিরে এলেন তাঁরা। মূঢ়ের মতো মুহূর্ত দুই তাকিয়ে থেকে, যেন কিছুটা হতভম্ব হয়ে, হকচকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'আরে রণেন! এসো এসো—' ঘর ফাটিয়ে উচ্চ হাসির রোল তুললেন বিনয়ভূষণ। ঘরের গুমোট শ্বাসরুদ্ধ হাওয়াটা যেন হাঁফ ছেড়ে হাল্কা হলো।

'ক্যামেরাটা তাহলে তোমার?...থাক্ থাক্ হয়েছে'—'আরে বসো, বসো—'হঠাৎ অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন অনুপমা। রণেন নত হয়ে অনুপমা ও বিনয়ভূষণকে প্রণাম করলো। তারপর মাথা তুলে, লাজুক মুখে মিষ্টুর চোখের ভেতর এক পলক চোখ ফেলে, চোখ সরিয়ে নিলো।

মিষ্টুর মুখের সচকিত বর্ণান্তর রণেনের মুখের ভাঁজে ভাঁজে হাসি ছড়ালো, স্মিতহাস্যে বিনীত গলায় বললো রণেন, 'ক্যামেরাটা মিষ্টুর।'

[গল্প ভারতী

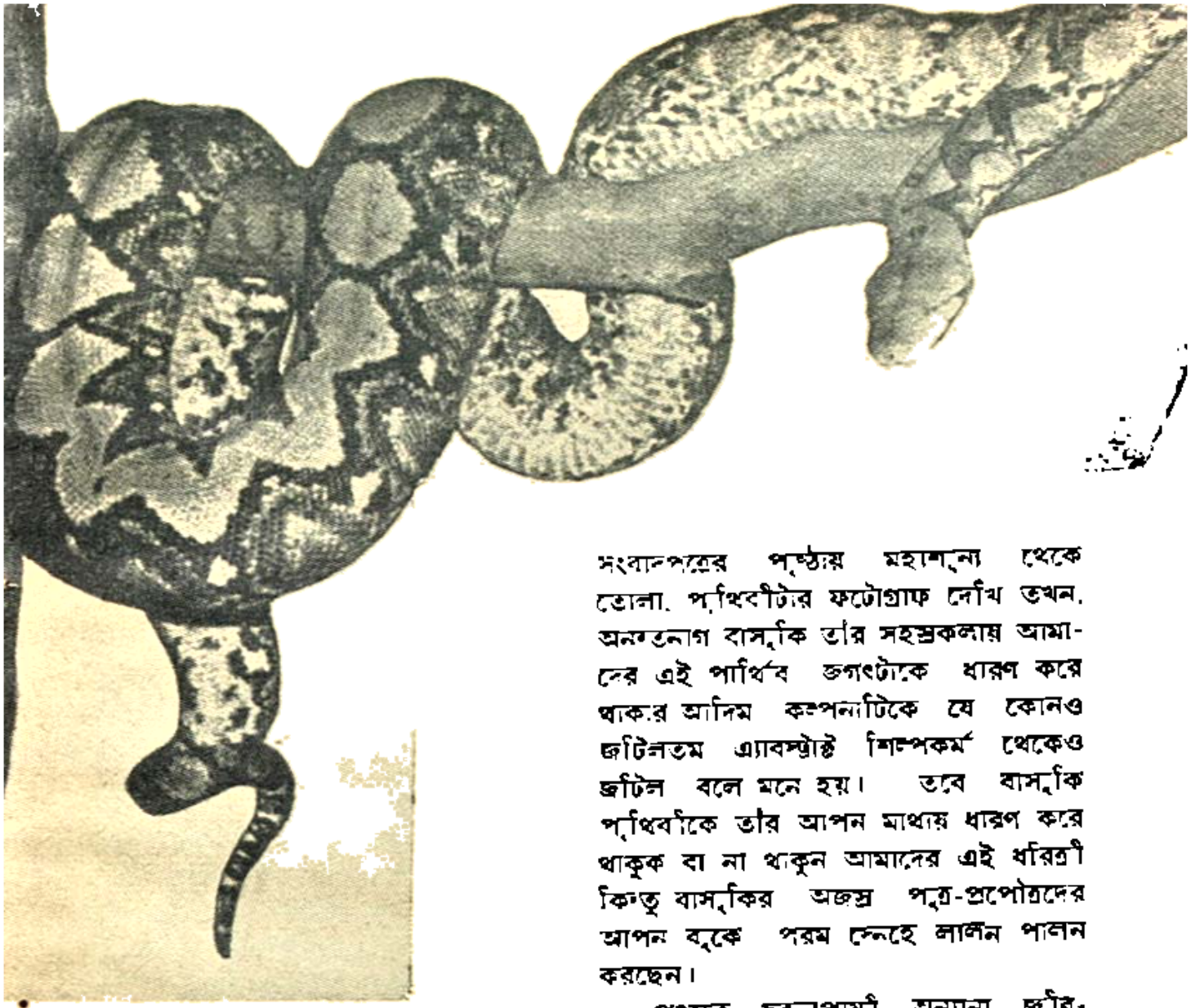

নাগ-তথ্য

হেমকেশ ভট্টাচার্য

আজকের এই যুগে, যখন চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আমরা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় মহাশূন্য থেকে তোলা পৃথিবীটার ফটোগ্রাফ দেখি তখন, অনন্তনাগ বাসুকি তাঁর সহস্রফলায় আমাদের এই পার্থিব জগৎটাকে ধারণ করে থাকার আদিম কল্পনাটিকে যে কোনও জটিলতম এ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্পকর্ম থেকেও জটিল বলে মনে হয়। তবে বাসুকি পৃথিবীকে তাঁর আপন মাথায় ধারণ করে থাকুক বা না থাকুন আমাদের এই ধরিত্রী কিন্তু বাসুকির অজস্র পুত্র-প্রপৌত্রদের আপন বুকে পরম স্নেহে লালন পালন করছেন।

প্রথমত স্তনপায়ী অন্যান্য জীবজন্তুর মত এদের শরীরে বয়সের ছাপ পড়ে না। আশ্চর্য রকমভাবে এরা এদের তারুণ্য চিক্কণতা এবং শারিরীক শক্তি-সামর্থ্যকে বাঁচিয়ে রাখে। বয়সের সংগে সংগে এদের বৃদ্ধির হার কমে এলেও তা কখনই একেবারে থেমে যায় না।

দ্বিতীয়ত আয়তন দেখে বয়স নির্ণয় করতে হয় বলে জন্মকাল থেকেই এদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এবং সঠিক তথ্য জানতে হলে আমাদের তা পেতে হবে তাদের স্বাভাবিক আবাস

থেকে। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের বৃহদায়তন সর্পকুলের ঘরকন্নার রূপকথা যতই চিত্তগ্রাহী হোক, তা সংগ্রহ করা একেবারেই দুঃসাধ্য।

চিড়িয়াখানার কৃত্রিম আবহাওয়াকে যতদূর সম্ভব বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্বাভাবিক করে তুলে এদের সম্বন্ধে যে সব খবরাখবর নেওয়া হয় আজ পর্যন্ত তা দিয়েই আমাদের খুশি থাকতে হয়।

বিভিন্ন কাগজপত্রে সান ডায়গো জু থেকে অ্যানাকণ্ডা জাতের সাপ এবং পিট্‌সবার্গ-এর হাইল্যাণ্ড পার্ক জু থেকে অন্যান্য বৃহদাকার সর্পকুল সম্বন্ধে অনেক তথ্য পরিবেশিত হয়। কিন্তু কোন জাতের সাপ সব চেয়ে বড় হয় তা এখনও সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি। নাগলোকের বিভিন্ন অধিবাসীদের মধ্যে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার পাইথনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হলেও দক্ষিণ আমেরিকার সুবিস্তীর্ণ জলাভূমির অ্যানাকণ্ডা জাতের সাপ সম্বন্ধে এমন সব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে যা চমকপ্রদ।

পৃথিবীর বিভিন্ন সাপের মধ্যে পিট্‌সবার্গের সংগ্রহশালার একটি পাইথন সাপই সবচেয়ে বড়। এই সাপটার বৃদ্ধির হার প্রতি বছরে প্রায় দশ ইঞ্চি। ১৯৫৬ সালে এর দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে ২৮ ইঞ্চি। এর নাম কলোসাস্‌। এই পাইথন সাপ প্রায় ৩৩ ফিট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে বলেও জানা গেছে।

খুব বড় আকারের অ্যানাকণ্ডা সাপ সভ্য মানুষের সংগ্রহশালায় এসে না পৌঁছলেও এ সাপ প্রায় ৪০ ফিট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে বলে কেউ কেউ বলেন। ৪০ ফিট লম্বা এই অ্যানাকণ্ডা সাপের ওজন ১০০০ পাউণ্ডেরও বেশী হতে পারে।

দক্ষিণ আমেরিকার যে সব অঞ্চলে এই সাপের বাস সেখানকার জনবসতি অত্যন্ত বিরল। এই সব নানা কারণে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন খুব বড়জাতের অ্যানাকণ্ডা সাপ হয়ত কোনদিনও সংগ্রহ করা যাবে না।

ভারত এবং আফ্রিকার রক পাইথন প্রায় ২০ ফিট পর্যন্ত লম্বা হয়। জন্মাবার পর ছয় থেকে সাত বছর পর্যন্ত এদের বৃদ্ধির হার প্রায় ৯ ইঞ্চি করে। তারপর এদের বাড় কমে আসে। হিসেব করে দেখা গেছে ১৭ ফিট লম্বা একটা ভারতীয় রক পাইথনের বয়স প্রায় ৩৪ বছর।

সমবয়সী স্ত্রী এবং পুরুষ পাইথনের মধ্যে দৈর্ঘ্যের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ তিন বছর অন্তর স্ত্রী সাপেরা ডিম পারে এবং কোন আহারাদি গ্রহণ না করে ঠায় ছ'মাস ধরে তাদের ডিম এবং বাচ্চাগুলির তদারক করে কাটিয়ে দেয়। এই জন্য তাদের শরীরের বাড় অন্তত ছয় মাসের মত থেমে যায়। পুরুষ জাতের সাপগুলো কিন্তু এই সময়ে যথারীতি আহার বিহার করতে থাকে এবং আয়তনেও স্ত্রী সাপদের ছাড়িয়ে যায়। ২০ ফিট লম্বা স্ত্রী এবং পুরুষ পাইথনের মধ্যে প্রায় পাঁচ বছরের ব্যবধান হতে পারে। স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতের সাপেরই বয়সের সংগে সংগে বৃদ্ধির হার ক্রমাগত লক্ষ্যণীয়ভাবে কমে আসতে থাকে। এবং এই প্রসঙ্গে এখনও প্রচুর গবেষণার অবকাশ রয়েছে।

[সায়েন্স ডাইজেস্ট

অমিয় চট্টোপাধ্যায়

'আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রসাধনী দ্রব্যের ওপর আপনার যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না থাকে তাহলে এখন অর্ধেক মাত্র দাম দিয়ে দ্রব্যটি নিয়ে যান, বিয়ের পর বাকি অর্ধেক দিয়ে যাবেন।' কথাটি বলেছিল ইওরোপের এক সৌন্দর্যসাধক দ্রব্য প্রতিষ্ঠানের বিক্রেতা একটি কুমারী মেয়েকে। কথাটির তাৎপর্য : তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রসাধনী ব্যবহার করার পর একজন অবিবাহিতা নারীর পক্ষে একটি শাঁসালো স্বামী সংগ্রহ করে নেওয়া খুবই সহজ হবে। এ থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, কোনও সুন্দরীকে পুরুষের চোখে আরও সুন্দর করে দৃশ্যমান করাতেই প্রসাধনীর সার্থকতা।

বর্তমানকালে আপনি সাজ-পোশাক-প্রসাধনে যত সুন্দর হয়েই পুরুষের সামনে আসুন না কেন, কারুরই তাতে আপত্তি থাকবে না। মধ্যযুগে ইওরোপে কিন্তু এমনটি ছিলনা। সে সময়ে ইওরোপে মেয়েদের সৌন্দর্যসাধক দ্রব্য ব্যবহারের ব্যাপারটা রাজকীয় কানুনে বাঁধা ছিল। প্রসাধনী ব্যবহার করলে নিজেদের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে পুরুষদের অন্যায়ভাবে ধাপ্পা দেওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হত সেকালের মেয়েরা।

মধ্যযুগে ইওরোপের প্রসাধন ব্যবহারের বিধি-নিষেধ থাকলেও হাজার হাজার বছর ধরে মেয়েদের মধ্যে নানান ধরনের সৌন্দর্য-

সাধক দ্রব্য এবং সাজ-পোশাক ব্যবহার করার রীতি দেশ-কাল ভেদে চলে আসছে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে একটি নারী দেহের মমি পাওয়া গেছে যার অংগে অংগে প্রসাধন ব্যবহারের চিহ্ন এখনও বর্তমান। মেয়েটির কোঁকড়ানো চুল, কালো রং দিয়ে আঁকা ঘন ভুরু, রং করা নখ এবং লাল রাঙানো ঠোঁট এ-যুগেও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে হাজার হাজার বছর আগেও নারীর সৌন্দর্যচর্চায় এ-সবের ব্যবহার এ-কালের মতই প্রায় ছিল। প্রাচীন যুগে চীনদেশের মেয়েরা পুরু রং মুখে মেখে তবে পুরুষদের সামনে আসতো। এটিই ছিল তাদের সামাজিক নিয়ম।

যুগ যুগ ধরে মেয়েদের রূপচর্চার বিশিষ্টতা দেশকালের ব্যবধানে বিশেষ রীতি এবং সীমানার মধ্যে বাঁধা। নিগ্রো মেয়েদের চুল স্বভাবতই কোঁকড়ানো। কোঁকড়ানো চুলকে কি করে সোজা রেখে বাঁধা যায়, কেশচর্চায় সেটিই তাদের আন্তরিক চেষ্টা। সৌন্দর্যবর্ধনের প্রয়োজনে অন্য দেশের মেয়েরা যে সোজা চুল 'কার্ল' করে, এ-কথা শুনলে অবাক হয় আফ্রিকার আদিবাসী মেয়েরা। তারা আরও বিস্মিত হয় অন্য দেশের মেয়েদের সাদা অথবা হাল্কা রঙের পাউডার-ব্যবহার রীতির কথা শুনে। তাদের রূপচর্চার পাঠে তারা কোনও দিন শেখেনি যে সাদা বা ঈষৎ লালচে পাউডার মেখে মুখের ত্বককে ফর্সা করে নারীরূপের সৌন্দর্যবর্ধন করতে হয়। সভ্যজগতের মেয়েরা ব্যবহার করে হাল্কা রঙের সাদা পাউডার; তাদের কিন্তু পাউডারের রং মিশ্ কালো। কেনিয়ার আদিবাসী কাভিরাণ্ডোজদের গায়ের রং সব চাইতে কালো, আর তাদের মেয়েরা মুখের ত্বককে মসৃণ করার জন্যে যে পাউডার ব্যবহার করে তা তাদের দেহের রঙের চেয়েও কালো। সভ্যদেশের মেয়েরা যেমন ফর্সা হওয়ার জন্যে পাউডার মুখে মাখে, কাভিরাণ্ডোজ মেয়েরা তেমনি আরও কালো হবার চেষ্টা করে কাঠকয়লার সূক্ষ্ম গুঁড়ো সারা মুখময় মেখে। তাদের মধ্যে যে মেয়ে সব চাইতে কালো হতে পারবে সেই পুরুষের চোখে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী হিসেবে সম্মান পাওয়ার অধিকারী হবে।

আফ্রিকার আর এক আদিবাসীর নাম মাসাই। মাসাই মেয়েদের মাথায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে। তাই তাদের রূপসাধনায় কেশচর্চার আধিক্য নেই। সৌন্দর্যচর্চায় অলংকারই সে মেয়েদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। অলংকার আবার সোনা-রুপোরও নয়; দস্তা অথবা তামার মোটা বেড়ি। একজন মাসাই মেয়ে তার রূপ বর্ধনের জন্যে একমণ ওজনের অলংকার হাতে-পায়ে গায়ে-গলায়-মাথায় পরেছে—এমনও দেখা গেছে। বিষুবীয় আফ্রিকার আদিবাসী উবাংগী মেয়েদের সৌন্দর্য বিধানের জন্যে অল্প বয়সেই ঠোঁটের চামড়া কেটে কাঠের একটি চাকৃতি সেলাই করে পরিয়ে দেওয়া হয়। দৈর্ঘ-প্রস্থে সে চাকৃতির পরিমাপ কুড়ি ইঞ্চিরও বেশি হয়ে থাকে।

অশিক্ষিত আদিবাসী মেয়েরা ছাড়াও সভ্যদেশের সৌন্দর্যসাধনার ইতিহাসেও বহু বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়েছে। কয়েকবছর আগে লণ্ডনের একটি কেশ-পরিচর্যা প্রতিযোগিতায় যে মেয়েটি প্রথম হয়ে দু' হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পেয়েছিল, তার কেশ-সজ্জা দেখে সবাই বিস্মিত হয়েছিল। চুলকে সে এমনভাবে বেঁধেছিল যে দেখেই মনে হয়েছিল সোনালী সেই চুল সমুদ্রের কয়েকটি ঢেউ ছাড়া আর কিছুই

নয়। আর সেই ঢেউ-এর ওপর সাজিয়ে দিয়েছিল পঞ্চম লুই-এর আমলের একটি সমুদ্র-জাহাজের ছোট্ট মডেল। আমাদের

কাছে এমন একটি সংবাদ সত্যিই বিস্ময়ের। ইওরোপের মেয়েদের কাছে আরও বিস্ময় ভারতীয় মেয়েদের দীর্ঘ ঘন কালো কেশ।

সাম্প্রতিককালের সৌন্দর্য-বিশেষজ্ঞরা এ-কথা প্রমাণ করেছেন যে শুধুমাত্র পুরুষের চোখকে ধাঁধিয়ে দেবার জন্যেই মেয়েরা সৌন্দর্যসাধনা করেনা। সুন্দরের প্রতি স্বাভাবিক একটা স্পৃহাই মেয়েদের রূপ-চর্চার অন্যতম কারণ।

প্রাচীন ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি ক্লিওপেট্রা নেইল পালিশ ব্যবহার করতেন। সে-যুগে প্রসাধনী ব্যবহারের প্রচলন ক্লিওপেট্রার মত বনেদী বংশের মেয়েদের মধ্যেই সীমিত ছিল। কারণ প্রাচীন যুগে প্রসাধনের সরঞ্জাম এ-কালের মত সুলভ এবং সহজ-লভ্য ছিলনা। আজকের সৌন্দর্যচর্চাকে সহজ এবং সুলভ করে দিয়েছে আধুনিক কালের রসায়ন বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি।

সৌন্দর্যসাধক শিল্প-দ্রব্যের ব্যবসা বর্তমান বিশ্বে বিরাট লাভজনক। বছরে প্রায় আড়াইশো মিলিয়ন টাকা শুধুমাত্র ক্যানাডার মেয়েরাই খরচ করে সৌন্দর্য-সাধনায়। ক্যানাডার পরিসংখ্যানের তুলনায় ভারত এখনও অনেক পেছনে। রূপচর্চায় ভারতীয় মেয়েরা খরচ করে বছরে প্রায় তিরিশ মিলিয়ন টাকা। যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় এ সংখ্যা অতি সামান্য। ভারতে নারীর সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় দ্বিগুণ, তবুও রূপ-সৌন্দর্য-সাধনার খাতে যুক্তরাষ্ট্রের মেয়েদের বার্ষিক ব্যয় প্রায় আড়াই হাজার মিলিয়ন। আর কোনও দেশ এই বিরাট ব্যয়ের নাগাল ধরতে পারেনি এ পর্যন্ত।

আধুনিককালের সৌন্দর্যসাধনার শিল্প-প্রয়াস সমকালীন রসায়ন বিজ্ঞানের ওপর প্রায় পুরোপুরি নির্ভরশীল। আবার রসায়ন বিজ্ঞান মানেই পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান; তাই রসায়ন বিজ্ঞানের দ্রুত পরিবর্তনের সংগে সংগে সৌন্দর্য-সাধক দ্রব্যাদির গুণাগুণেরও হামেশাই রদবদল হচ্ছে। সেকালের রসায়ন বিজ্ঞানীরা স্বাভাবিক এবং মূল দ্রব্য থেকে নির্যাস সংগ্রহ করে তা' থেকেই প্রসাধনী প্রস্তুত করতেন। এ নিয়মে কাঁচা মাল এবং সময় লাগতো প্রচুর; খরচও হত অস্বাভাবিক রকমের। সে ব্যয় সকলের পক্ষে বহন করা মোটেই সহজ ছিলনা। আধুনিককালে কিন্তু প্রায় সব মেয়েই সৌন্দর্য বিধানের জন্যে খরচ করতে পারে। সৌন্দর্যসাধক সমস্ত দ্রব্যই এখন সাধারণের আর্থিক সংগতির আওতার

মধ্যে। তার কারণ রসায়ন বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার। রসায়নে মিশ্রণ পদ্ধতির (সিনথেটিকস) সাহায্যে এযুগে নানান ধরনের সৌন্দর্যসাধক সুগন্ধি-দ্রব্য তৈরি হচ্ছে এবং সেগুলি ব্যবহার করার মত আর্থিক সংগতিও প্রায় সবাইয়েরই আছে। প্রাচীনকালে রসায়ন বিজ্ঞানীরা পঁচিশ টন ভায়োলেট ফুলের পাপড়িকে নিংড়ে এক আউন্স ভায়োলেট নির্যাস সংগ্রহ করতো। এ থেকেই অনুমান করা যায় এক আউন্স খাঁটি নির্যাস বা আতর কি সাংঘাতিক মূল্যবান ! রসায়ন বিজ্ঞানে মিশ্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে গোলাপের আতর পেতে হলে একটিও গোলাপের প্রয়োজন হবেনা আজ। এই রাসায়নিক পদ্ধতিতে সহজলভ্য জংলী গাছ-পাতা থেকেও সুগন্ধি গোলাপের আতর তৈরি করা সম্ভব এ-যুগে।

বৈজ্ঞানিক মিশ্রণ পদ্ধতিতে আশ্চর্যতম আবিষ্কার কস্তুরী সুগন্ধি। তিব্বতের পুরুষ কস্তুরী মৃগর মাংস-গ্রন্থি থেকে সংগৃহীত আসল কস্তুরী সুগন্ধির আনুমানিক মূল্য পাউন্ড প্রতি প্রায় দু'লক্ষ টাকা। কিন্তু মিশ্রণ পদ্ধতির সাহায্যে যে কস্তুরী সুগন্ধি তৈরি হয় তার এক পাউন্ডের দাম আসলের তুলনায় অতি সামান্য। যদিও নকল সুগন্ধির গন্ধ এবং উগ্রতা কোনও অংশে কম নয় আসলের চেয়ে। এমনি অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সহজ এবং সুলভ করে দিয়েছে, নারীজাতির সৌন্দর্য-সাধনার পথকে।

মেয়েদের রূপচর্চায় বিজ্ঞানের দান অপরিসীম এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই ; কিন্তু তবু এটিই সব নয়। স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিকাশের জন্যে আরও কিছুর প্রয়োজন আছে। হিন্দুশাস্ত্রে প্রাচীন পণ্ডিতদের মতে সুন্দর হতে হলে মনকে করতে হবে সুন্দর এবং পবিত্র সবার আগে। মন-ই দেহ এবং দেহই মন। দেহের সৌন্দর্যের সংগে মনের সৌন্দর্য-পবিত্রতার নাড়ীর সম্পর্ক চিরকালের।

সুনীল রায়

এক রহস্যময় জটিল মামলার বিচার চলেছে আদালতে। মামলাটির জটিলতার গ্রন্থি-মোচনের কোন সূত্রই খুঁজে পাচ্ছেন

না বিচারক। তিনি চিন্তিত, বিব্রত। দিশে-হারা হয়ে একসময় তিনি নিজের মনেই বলে উঠলেন এই মামলার সঠিক বিচার করার জন্য প্রয়োজন সলোমনের বিজ্ঞতা।

কাছেই বসেছিলেন কেরানীবাবু। বিচারকের কথাগুলি তাঁর কানে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ হন্ হন্ করে আদালত-কক্ষের বাইরে চলে গেলেন। বাইরে গিয়ে তিনবার 'সলোমান সলোমান' বলে হাঁকলেন। তারপর ফিরে এসে বিচারককে বললেন সলোমন বলে কেউ হাজির নেই হুজুর।

ভোটের সময় ভোটপ্রার্থী এক ভদ্রলোক একদিন সকালে একজন ভোটদাতার বাড়িতে এলেন দেখা করতে। ভোটদাতাকে কথা প্রসঙ্গে ভোটপ্রার্থী বললেন আপনার ভোটটা আমি পাচ্ছি তো?

ভোটদাতাটি উত্তর দিলেন দেখুন,

আমি খুব দুঃখিত। অন্য একজন প্রার্থীকে ভোট দেব বলে আগেই আমি কথা দিয়ে ফেলেছি।

ভোটপ্রার্থী ভদ্রলোকটি হেসে উঠলেন। বললেন আরে, তাতে কী হয়েছে? দেখছি এখনও ছেলেমানুষ আছেন। রাজনীতিতে কথায় আর কাজে বহুৎ ফারাক্। কথা দিলেই তা' রাখতে হবে এমন কোন কথা আছে নাকি?

উত্তরে বিনীতভাবে ভোটদাতা বললেন তা' যদি হয় তাহলে আপনাকে কথা দিতে আমার কোন আপত্তি নেই।

দু' বন্ধু—ভোমলা আর গামলা। অনেকদিন পরে রাস্তায় হঠাৎ দুজনের সাক্ষাৎ। কুশল বিনিময়ের পর ভোমলা গামলাকে জিজ্ঞেস করল হ্যাঁরে, শুনলুম

তোর বড়লোক পিসী নাকি মারা গেছে? সত্যি খবর?

গামলা মুখটা গম্ভীর করে উত্তর দিল: হ্যাঁ, সত্যি। তুইতো জানিস্ এই পিসীর জন্যে কী না করেছি আমি! পিসীর কুকুর পোষার বাতিক ছিল। একটা নয়, দুটো নয়, চার চারটে কুকুর ছিল। এই কুকুরগুলো ছিল পিসীর চোখের মণি কিন্তু আমার ছিল দুচক্ষের বিষ। দেখলেই মনে হত ওগুলোকে গুলি করে মারি। কিন্তু পিসী পাছে চটে যায়, উইলে সম্পত্তি থেকে পাছে আমায় বঞ্চিত করে, এই ভয়ে একটানা আটবছর এই কুকুরগুলোর সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছি আমি। এই দীর্ঘকাল জানোয়ারগুলোকে ভালোবাসার ভান করেছি। তুইই বল্, পিসীর জন্যে আমি কী যথেষ্ট সহ্য করি নি?

ভোমলা ঠোঁটকাটার মত বলে উঠল পিসীর জন্যে বলিস নি, অধর্ম হবে; বল, পিসীর সম্পত্তির জন্যে সহ্য করেছিস। তা' যাই হোক, তোর পিসী উইলে তোকে মোটারকম কিছু দিয়ে গেছে তো?

মুখটা ব্যাজার করে গামলা বলল হ্যাঁ, একেবারে রাজা করে দিয়ে গেছে! পিসী উইল করে তার সমস্ত টাকাকড়ি আর জমি-জমা দিয়ে গেছে রামকৃষ্ণ আশ্রমকে। আর আমায় দিয়ে গেছে ঐ চারটে কুকুর! উইলে লিখে গেছে—কুকুর চারটি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ গামলার অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং ঐ চারিটি প্রাণীকে তাহার হাতেই দিয়া গেলাম।'

কামাখ্যাবাবু তাঁর বন্ধুর কাছে খেদ করছিলেন জান, আজকালকার ছেলেদের স্মৃতিশক্তির বহর দেখলে দুঃখ হয়। একটা কথা মনে রাখতে পারে না হে! অথচ আমায় দেখ। বাহাত্তর বছর বয়স হয়েছে, কিন্তু স্মৃতিশক্তি অটুট আছে। বয়সের দরুণ কেবল তিনটি জিনিস আমি মনে রাখতে পারি না। সে কথাটাও আমি ঠিক মনে রেখেছি। প্রথমত, কারও নাম আমি মনে রাখতে পারি না। কেউ যদি বলে তার নাম 'অমলেশ', পরের মুহূর্তেই তাকে

'গোমেশ' বলে ডেকে উঠি। দ্বিতীয়ত, কারও মুখ আমি মনে রাখতে পারি না। গোলদীঘিতে দেখা ভদ্রলোকের মুখের সংগে গোলকুণ্ডায় দেখা ভদ্রলোকের মুখের কেমন যেন গণ্ডগোল হয়ে যায়। আর তৃতীয়ত একটা কী জিনিস যে মনে রাখতে পারি না সেটা এখন ঠিক মনে করে উঠতে পারছি না। যাই হোক, তবু তুমি আমার স্মৃতিশক্তিকে দুর্বল বলতে পার কী?

ছোট্টরাজ্য সোনাগড়। সে রাজ্যের রাজা অকৃতদার, চিরকুমার। প্রধানমন্ত্রী বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান। প্রধানমন্ত্রী ওপর রাজার প্রগাঢ় আস্থা। কিন্তু সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর একটি মন্তব্যের সংগে রাজা কিছুতেই একমত হতে পারছেন না। প্রধানমন্ত্রী অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সমস্ত পুরুষ-মানুষই তাদের স্ত্রীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। স্ত্রীর আদেশ অমান্য করার সাহস কোন বিবাহিত পুরুষের থাকে না।

এ বিষয়ে রাজার সংগে প্রধানমন্ত্রীর মতভেদ হল। রাজা কথাটা যাচাই করে দেখতে মনস্থ করলেন। রাজ্যের সমস্ত বিবাহিত পুরুষ-প্রজাকে তিনি রাজসভায় ডাকিয়ে আনলেন। জানিয়ে দিলেন, তাদের যে প্রশ্ন করা হবে তার সঠিক উত্তর না দিলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

এরপর প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা শুরু করলেন : তোমাদের মধ্যে যারা সব কাজে স্ত্রীর আদেশ শিরোধার্য করে চল, তারা আমার বাঁদিকে এসে দাঁড়াও। যারা তা' করে না, তারা এসে দাঁড়াও আমার ডানদিকে।

প্রধানমন্ত্রীর বাঁদিকে ভিড় জমে উঠল। একজন বাদে আর সমস্ত প্রজাই এসে দাঁড়াল প্রধানমন্ত্রীর বাঁদিকে।

রাজা পুলকিত হলেন। যাক, রাজ্যে অন্তত একজন বিবাহিত পুরুষমানুষ আছে যে স্বমতানুবর্তী, স্ত্রী-সন্ত্রাসিত নয়। খুশি হয়ে রাজা ঐ অসাধারণ ব্যক্তি-টিকে বললেন ডানদিকে যখন দাঁড়িয়েছ তখন বুঝতেই পারছি যে, আমার অন্যান্য প্রজাদের মত তুমি স্ত্রৈণ নও। আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব।

এমন সময় লোকটি বলে উঠল মহারাজ, আপনি যা ভাবছেন তা' নয়। আমার ডানদিকে দাঁড়াবার একটি বিশেষ কারণ আছে। আমি যখন বাড়ি থেকে রাজ-সভার উদ্দেশ্যে রওনা হই, তখন আমার স্ত্রী আমাকে ভিড় থেকে সর্বদা দূরে থাকতে বলেছিল। বাঁদিকে ভিড় দেখে আমি তাই ডানদিকে দাঁড়িয়েছিলুম। আমায় মার্জনা করবেন।

লোকের ছিল বিদ্যুত
সূক্ষ্ম তরল পদার্থ

টেলস্টার

হিরণ্যপ্রিয়

মঙ্গলে উষা বুধে পা', শুভকার্যে যেখানেই যাওয়া যাবে সেখানেই সিদ্ধিলাভ। ১০ই জুলাই, মঙ্গলবার মার্কিন উপগ্রহ আকাশে যাত্রা করলো। এর আগে অনেক রাশিয়ান আর আমেরিকান উপগ্রহ চাঁদের প্রতিবেশী হয়ে পৃথিবীর বৈমানিকদের অনেক খবর দিয়েছে মহাকাশের কিন্তু সেদিনের ঐ উপগ্রহটি এক কান্ড করলো। সেই অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটালো উপগ্রহ টেলস্টার, সেই মহাশূন্য থেকে সংবাদ আদান-প্রদান করতে লাগলো। এর সাহায্যে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে অতি অল্প সময়ে খবর পাঠানো যাবে, টেলিভিসন দেখা যাবে এবং টেলিফোন করা যাবে। টেলস্টারের এক পরীক্ষায় দেখা গেছে কোন জায়গা থেকে সংবাদপত্রের আলোকচিত্র টেলস্টারে পাঠালে কয়েক-মিনিটের মধ্যে বহু দূর দূরান্তে তার নকল পাঠিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু টেলস্টার বর্ণনা করার আগে টেলিভিসনের কথাটা আবার বলা যাক। কেননা টেলিভিসনের উন্নতিই ঘটবে সর্বাধিক।

এখন মানুষ চাঁদে যেতে পারবে কি পারবে না সেই নিয়ে যেমন লোকে চিন্তা করে তিন দশক আগেও লোকে তেমনি-ভাবে ভাবতো যে টেলিভিসন যন্ত্রটি সম্ভব কিনা। এখন টেলিভিসন মানুষের জীবন-যাত্রার পদ্ধতিই পাল্টে দিচ্ছে। মানুষ যাত্রা থিয়েটার শিখতো, রামায়ণ-গান শুনতো, এখন ঘরে ঘরে রেডিও শোনে কিংবা সিনেমা দেখে কিন্তু এই দুইয়ের ফললাভ হয়েছে টেলিভিসনে।

টেলিভিসন দূর থেকে দেখা ও শোনা।

শব্দের তরঙ্গ কেমন করে দূর দূরান্ত থেকে এসে রেডিও সেটে ধরা পড়ে, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় আমরা এর আগেই দেখেছি। এবার ছবির কথা। আমরা যখন কোন ছবি দেখি তখন ছবি থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়ে বলেই আমরা ছবিটিকে দেখতে পাই। আলোর প্রতিফলনের তারতম্যের জন্যে উজ্জ্বলতার তফাৎ দেখি। এটা সাধারণ বিজ্ঞানের কথা। টেলিভিসনের সময় এই চোখটা হয় বৈদ্যুতিক। আলো ছবি থেকে প্রতিফলিত হয়ে পড়ে ফটো-ইলেকট্রিক সেলের উপর। এই জিনিসটি আলোকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত করে সেটা তখন দূর-দূরান্তে যাত্রা করে তার দিয়ে কিংবা বেতারে গিয়ে রেডিও সেটে। ছবিটা হাজার হাজার ফুটকিতে ভাগ হয়ে আবার মিলে গিয়ে ছবি হয়। এই কথা বোঝাতে গিয়ে এক বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখক বলেছেন যে টেলিভিসনের মূলকথা, আলো ও শব্দের তরঙ্গ ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক তরঙ্গে পরিণত হয় তারপর সেটে গিয়ে ধরা পড়ে। পদ্ধতিটি অতি সোজা, একটা বড় চিঠিকে ছোট টুকরো করে বিভিন্ন খামে করে পাঠানো হলো, তারপর সেই বিভিন্ন খাম থেকে টুকরোগুলো বের করে জোড়া দিয়ে পাঠোদ্ধার করা। এখন ইলেক্-

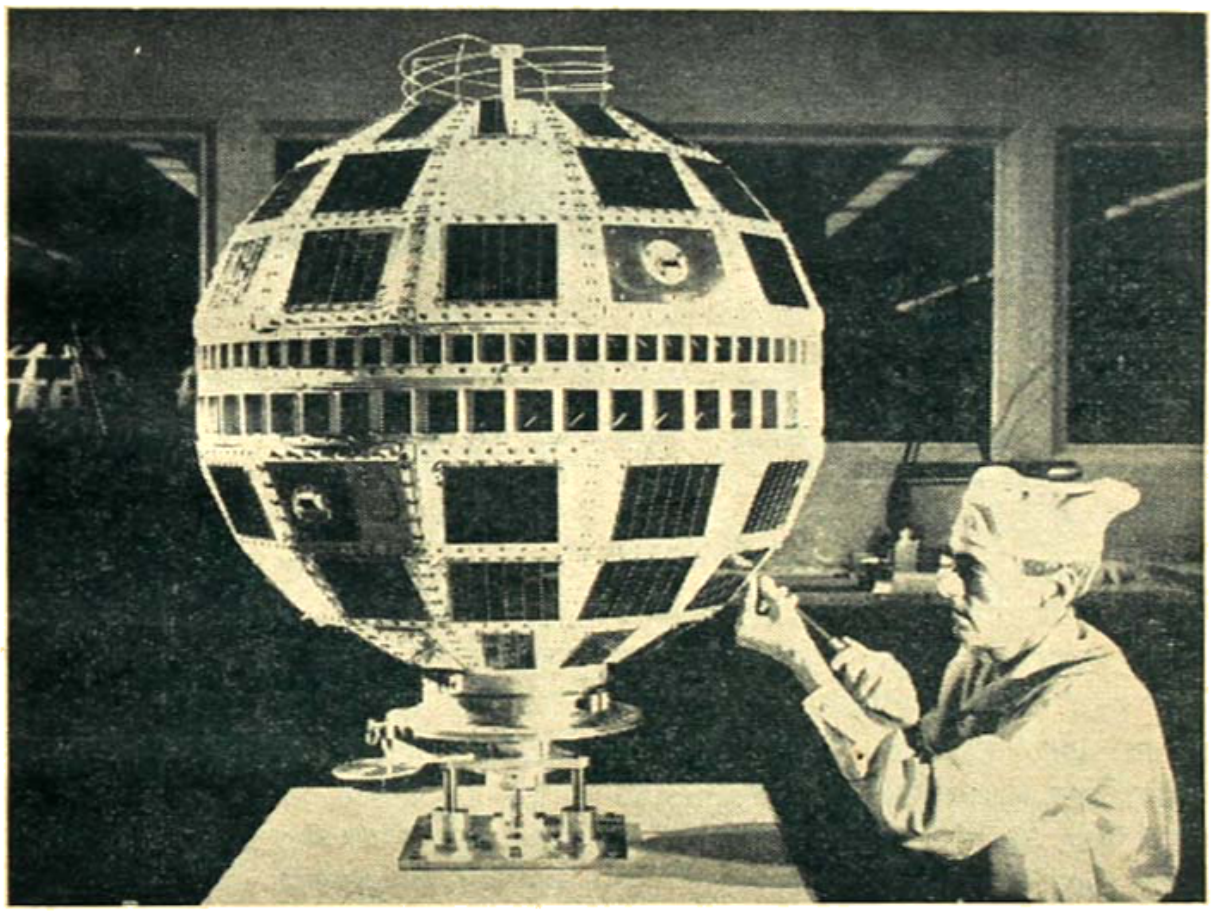

ট্রনের দৌলতে সব কিছুই অতি সহজে সম্পন্ন হচ্ছে।

এককালে লোকের ধারণা ছিলো যে, এসব পাচ্ছি আর যখন এই কনডাক্টর ছাড়াই ইলেকট্রনের প্রবাহ সম্ভব হয় তখন ঘটে অঘটন। রেডিও, র‍্যাডার, টেলিভিসন

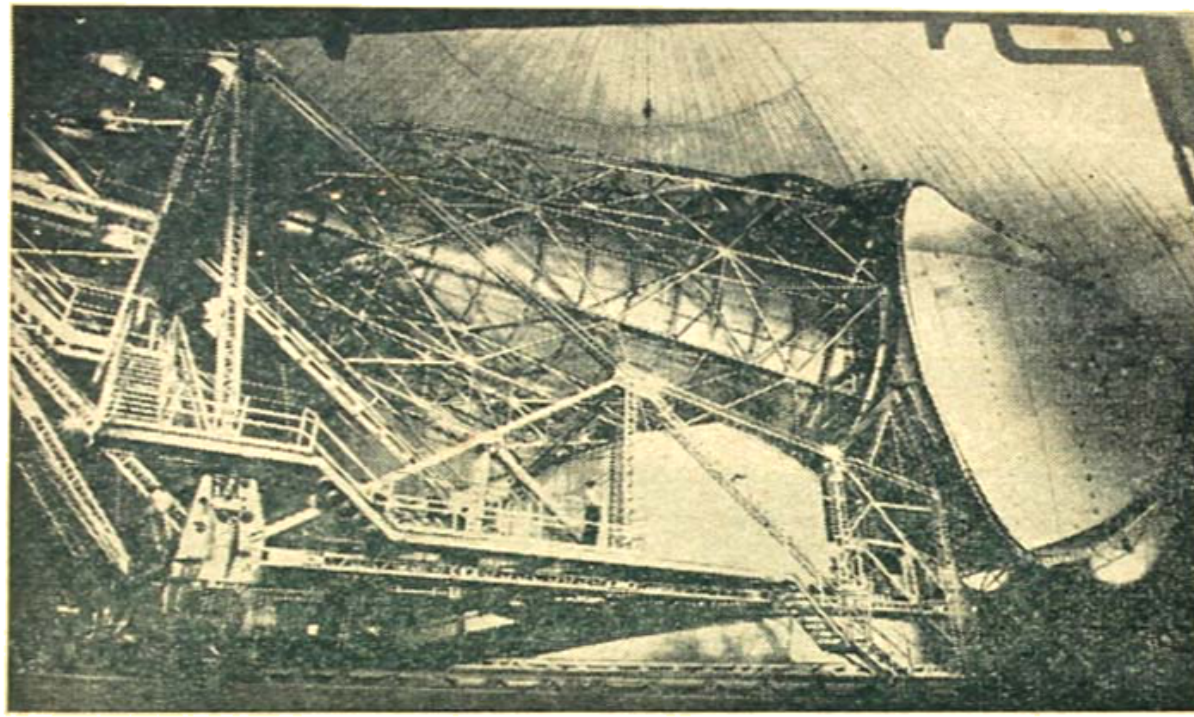

বিদ্যুৎ একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম তরল পদার্থ যা যে কোন জিনিসের মধ্য দিয়ে যাওয়া-আসা করতে পারে। কিন্তু ভ্রান্ত ধারণার অবসান করলেন বিজ্ঞানী মাইকেল ফারাডে, সেও ইলেকট্রন আবিষ্কারের ত্রিশ বছর আগে। বিদ্যুৎ যে সত্যিকারের কি পদার্থ তা কেউ জানে না তবে এ ইলেকট্রনের সমষ্টি আর ইলেকট্রন হচ্ছে পরমাণুর গুঁড়ো যার ওজন এক গ্রামের কোটি কোটি ভাগের এক ভাগেরও কম—অর্থাৎ যা হিসাব করে কল্পনা করা যায় না। ইলেকট্রন বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, কনডাক্টর বা তামার তার জাতীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে টেলিফোন, ডায়নামো, আলো ইত্যাদির উদ্ভাবন হল সেইভাবে।

কিন্তু এইসব কাণ্ডকারখানার সীমানা সেদিন পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিলো। সমুদ্রের নীচে কিংবা পাহাড়ের অন্তর্ভাগে তার দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও আছে কিন্তু এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে, আমেরিকা থেকে ইউরোপে কিংবা আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় তার দিয়ে সংযোগ ব্যবস্থা অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ। টেলিভিসনও এত দূরদেশে সম্ভব ছিলো না। অবশ্য রেডিও দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা বর্তমান। কিন্তু তাও মাঝে মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হয়। পৃথিবীর চারধারে বায়ুমণ্ডলে এক স্তর আছে যা বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন এবং যার নাম

নায়নোস্কোয়ার, সেইখানে শব্দ-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়েই দূর দেশের রেডিও সেটে ধরা পড়ে। কিন্তু সূর্যের বিকিরণে এমন কতকগুলি পর্দার্থের মাঝে মাঝে ঐ স্তরে আগমন হয় যার প্রভাবে প্রতিফলনের কাজে বাধা সৃষ্টি হয় এবং রেডিও ঠিক শোনা যায় না।

এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়ও বের হয়েছে অনেকদিন। এর জন্য দরকার কতকগুলো উঁচু টাওয়ার, ৪০ মাইল অন্তর অন্তর এবং টাওয়ারের মাথায় শব্দ-তরঙ্গ প্রতিফলনের যন্ত্রপাতি। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা বিচার করে এত টাওয়ার তৈরি করে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা মোটেই বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন নয়।

সুতরাং বৈজ্ঞানিকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান কোন উপগ্রহই এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। এবং মার্কিন উপগ্রহ টেলস্টার হলো এই পথের পথিকৃত।

প্রায় সতেরো কোটি টাকা খরচ করে কতকটা বেসরকারীভাবে এই জিনিসের আবিষ্কার হয়েছে। টেলস্টারের ভেতরে আছে রেডিও রিসিভার ও ট্রান্সমিটার যন্ত্র, কক্ষপথে পৃথিবী থেকে প্রায় ছশো থেকে সাড়ে তিন হাজার মাইল উপরে বিচরণ করছে এবং পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে আড়াই ঘন্টার কিছু বেশি সময় লাগে।

ধাতব কাঠামো ম্যাগনেসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি। আকার প্রায় গোল কিন্তু ১৭২টি চ্যাপ্টা অংশ আছে, এর ওজন ১৭০ পাউন্ড, ব্যাস প্রায় তিন ফুট এবং এর ভেতরে প্রায় পনের হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ আছে যন্ত্রপাতির।

টেলস্টারে কয়েকটা আয়না আছে যাতে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে খবর দিতে পারে এর অবস্থিতি সম্পর্কে। খবর দেওয়ার ও খবর নেওয়ার জন্যে দুটি অ্যান্টেনা উপগ্রহটিকে ঘিরে আছে। এর ভেতরের যন্ত্রপাতির সাহায্যে সূর্যকিরণকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করে ইলেকট্রনের যন্ত্রপাতি চালনার ব্যবস্থা আছে।

খুব ক্ষীণ শব্দ সংকেতকেও টেলস্টার লক্ষ লক্ষগুণ বেশি বাড়িয়ে দূর দূরান্তে পাঠাতে পারে। পাশ্চাত্যে টেলিভিসনের বহুল প্রচারের ফলে সিনেমার যে ক্ষতি হয়েছে সেজন্যে এখন চিন্তা করা হচ্ছে এমন প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের যেখানে টেলিভিসনের ছবি রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত করা হবে অর্থাৎ কলকাতার কোন প্রেক্ষাগৃহে বসে নিউইয়র্ক বা মস্কো শহরের নাচগান জলসা প্রায় একই সময়ে দেখা ও শোনা যাবে। টেলস্টার আবিস্কারের ফলে এই ঘটন আরো তাড়াতাড়ি ঘটবে।

অন্ধ ও বধির কল্প দৌড়ি

অনুভূতি বসু

প্রথম দৃষ্টিপাতে একটি অক্ষমের ব্যর্থতার দিকটি তার সকল সম্ভাবনাকে ছাপিয়ে এক অনির্দেশ্য বিষাদের সৃষ্টি করে দর্শকের মনে। কিন্তু অন্ধ ও বধির হেলেন কেলারের পরম সার্থক জীবন তার সকল অক্ষমতাকে নিষ্প্রভ করে অম্লান জ্যোতিষ্কের মত জনমানসে প্রদীপ্ত হয়ে থাকবে অনন্তকাল ধরে। মাত্র একুশ মাস বয়সে এক কঠিন ব্যাধির আক্রমণে তিনি চক্ষু ও কর্ণ দুটি ইন্দ্রিয়কেই হারিয়ে ফেলেন। কঠিন নৈঃশব্দ্যকে বহন করে ঘন যামিনীর অন্ধকার নেমে এলো যাঁর জীবনের প্রত্যূষলোকে, তাঁরই জীবনালেখ্যে দুটি অক্ষমতার স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে বলেই তাঁর বাণী দিয়ে দুটি অক্ষমতার পরিচয় দেবার প্রচেষ্টা করলাম এই নিবন্ধে।

হেলেন কেলার যখন ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বধির-শিক্ষণ-শিক্ষা বিভাগে গিয়েছিলেন তখন ওখানকার ছাত্র-ছাত্রী-বৃন্দ তাঁকে একটি প্রশ্ন করেছিল। কাল্পনিকতার আড়ালে প্রশ্নটিতে অবশ্য ছিল অক্ষমতা মূল্যায়নের একটা বিশেষ তাৎপর্য। প্রশ্নটি হচ্ছে, 'যদি কোন সঞ্জীবনী শক্তির প্রভাবে আপনি আপনার হারিয়ে যাওয়া দুটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটিকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম হন, তাহলে সর্বাগ্রে আপনি কোনটিকে কামনা করবেন?' এই প্রশ্নটি তাঁকে বিব্রত করতে পারে নি; তিনি দ্বিধাহীন-ভাবেই উত্তর দিলেন যে তাঁর অন্ধত্বকে বহন করতে তিনি অপারগ হবেন না যদি তাঁর শ্রবণশক্তি পুনরায় উন্মেষিত হয়। মনে হয় এই উত্তরটি শুনে জনসাধারণদের বিক্ষুব্ধ মন সংশয় আবর্তের মাঝে কোন অর্থের সন্ধান খুঁজে পাবে না। তার কারণ একটি অন্ধ দর্শকের মনে যে অতল-স্পর্শী বেদনার সৃষ্টি করে, তাতে প্রত্যক্ষ দৃষ্টির প্রত্যয়জ্ঞ আছে; আর সেই রূপটিও অতীব ভয়াবহ। কিন্তু বধিরের অক্ষমতা দৈহিক নয় বলেই তা প্রত্যক্ষগোচর হয় না বরং এদের সুপরিণত দেহের অন্তরালে অপরিণত ও অপরিমার্জিত চেহারাটি দেখে জনসাধারণ এদের বিকৃত ও কৌতুকের পাত্র বা পাত্রী বলে মনে করে। যেজন্য বধিররা আজও সমাজের অপাংতেয় হয়ে একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। কিন্তু

সমাজ তার দুবাহু সম্প্রসারিত করে অন্ধকে একাত্ম করে নিতে কোথাও দ্বিধা-বোধ করে নি।

এই চিন্তাধারা সমাজ চেতনার সংগে আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। আরিস্টোফেন থেকে শুরু করে বর্তমানের লেখক ও নাটকারের সৃষ্টিতে যেখানে মুহূর্তের জন্যেও এদের আবির্ভাব ঘটেছে, সেখানে এদের ভূমিকা নিছক হাস্যরস পরিবেশনের জন্যই, অথচ অন্ধত্বের মহিমায় কত মহাকাব্যই না অলংকৃত হয়েছে।

মানুষ সামাজিক জীব এবং সমাজ-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই তার ব্যক্তিত্বের সুপরিণতি ঘটে। একটি অন্ধের সমাজ ও আত্মীক জীবন কত ঐশ্বর্যময়; তার ভাব বিনিময়ের কোন বাধা নেই বলেই কত পথিকের আনাগোনা চলছে তার মানসলোকে। এ ছাড়া তার মনের নিভৃত-লোকে নিত্যপ্রবাহিত সুরছন্দময় আনন্দ-ধারার মংগলস্পর্শে সে পায় অমৃতের আস্বাদন। দর্শন ইন্দ্রিয়টির অভাব সত্ত্বেও অন্য ইন্দ্রিয়ভংগির পূর্ণ সহযোগিতায় সে পায় জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশের প্রশস্ত পথ, আজ ব্রেনপদ্ধতির অকুণ্ঠদানে তার পাঠ্য-সমস্যাও অপসারিত হয়েছে। দৃষ্টি-হীনের অন্ধকার জীবন তাই জ্ঞানের দীপালোকে যেমন প্রজ্জ্বলিত, তেমনি অবাক তার অবকাশ বিনোদনের জন্য উপকরণেরও অন্ত নেই।

ভাষার অভাবে বধিরের ব্যক্তিসত্তার ক্রমোন্নতি কখনও সম্ভবপর হয় না। সমাজের মধ্যে থেকে তাকে ভোগ করতে হয় নির্বাসনের কঠিন দণ্ডাজ্ঞা। যার ভাষা নেই, কেমন করে সে অন্যের কাছে ব্যক্ত করবে নিজের প্রয়োজনগুলি, কেমন করেই বা সৃজনের আনন্দে আত্মপ্রকাশ করবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাষার আবেদনে; অথবা কোন মায়ার প্রভাবে সে উপলব্ধি করবে অপরের বলা কথাগুলিকে? তার মানসলোকে যে নির্বাক চিত্রের নিরন্তর পট পরিবর্তন হচ্ছে, আর নিরপেক্ষ দর্শকের মত সে দেখে যাচ্ছে এই অবিশ্রান্ত চিত্র-প্রবাহকে যার কোন মর্ম গ্রহণ করতে সে সক্ষম হচ্ছে না। এই সূত্রে বলা দরকার যে শব্দই বস্তু ও ভাবের প্রতীক, এবং এদের অর্থদ্যোতক করাই শব্দের ধর্ম। শ্রুতিহীনতার ফলে একটি বধির চিন্তার মূল উপাদান প্রতীক-ধর্মী শব্দের প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত হবে, যে জন্য তার চিন্তার জগৎটি একেবারেই বন্ধ্যা হয়ে থাকবে। চিন্তা ও চেতনার উৎকর্ষতা ঘটে যখন শব্দ বস্তুগ্রাহী বিশ্বকে পার হয়ে বিমূর্ত ভাবলোকে মানুষকে পৌঁছে দেয়। এই স্তরে উন্নীত হওয়া একটি অন্ধের পক্ষে কঠিন নয়, কিন্তু একটি বধিরের কাছে তা আকাশ-কুসুমমাত্র। ভাষার অভাবে যার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দুরূহ হয়ে ওঠে, তার জীবনে সৃজন সংস্কৃতি ও পূর্ণতার দিকটি আশা করা মূর্খতামাত্র।

একটি অন্ধের দৈহিক নিরাপত্তার অসহায়ত্ববোধ সর্বাগ্রে আমাদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। প্রতি পদক্ষেপে পরনির্ভর-শীল জীবনের কল্পনায় আমরা আতংকে শিউরে উঠি বধিরের নিরাপত্তার সমস্যা ভিন্ন গোত্রের হলেও তার পরিধি ও গুরুত্ব কিছু কম নয়। অনেকেই হয়তো অবহিত নন যে দৃষ্টির চেয়ে শ্রুতিই আমাদের পরি-বেশের নানান খবর আমাদের কাছে বহন করে আনে এবং আমরা সচেতন অথবা অচেতন মনে তার অমোঘ নির্দেশগুলি

মেনে চলি বলে আমাদের নিরাপত্তা রক্ষিত হয়। বিশ্বজগতে সর্বকিছুই চলার আবেগে ধ্বনিত হচ্ছে এবং ধ্বনিবৈচিত্র্যের মধ্যেই আমরা তাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। শুধু দৃষ্টির দ্বারা যার বিশ্বজগৎ সীমায়িত, ধ্বনির সংকেত তার কাছে বিপদের কোন আশংকার খবর পৌঁছে দিতে পারে না। জীবনের প্রতিমুহূর্তে দৃষ্টির চেয়ে শ্রুতিই প্রধানত বার্তাবহকের কাজ করে তাই বিপদের ইংগিতটি প্রায় সর্বক্ষেত্রে সে সর্বপ্রথমেই আমাদের দিয়ে সচেতন করে তোলে। শ্রুতির অভাবে একটি বধিরের যে নিরাপত্তা প্রতি পদক্ষেপেই বিঘ্নিত হচ্ছে, দৃষ্টি শক্তির সাহায্যে সে তার কতটুকুই বা সমাধান করতে পারবে?

সুঠাম দেহের অন্তরালে পঙ্গু ও নিঃশেষিত মনটির খবর কেউ নিলে জানতে পারবেন যে দৃষ্টিসত্ত্বেও এদের জীবন আলোকের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত। সমাজের চির উপেক্ষিত এই গোষ্ঠীর অক্ষমতা দৃষ্টিহীনের চেয়েও যে আরো জটিল ও গভীর, সেই সত্যই কি হেলেন কেলারের উক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে সমর্থিত হচ্ছে না?

মানসিক অশান্তি প্রশমনে গভীর সুর রোগীদের বেশি খুশি করে তোলে

চিকিৎসার জন্য সঙ্গীত

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

ধরুণ দাঁত তোলাতে আপনার ডেন্টিস্টের চেম্বারে ঢুকতেই, তিনি আপনাকে উঁচু চেয়ারটায় বসিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করে বসেন, 'বলুন কি রকম গান আপনার পছন্দ—রবীন্দ্র, আধুনিক, পল্লী-সংগীত না উচ্চাঙ্গ-সংগীত?' তাহলে নিশ্চই আপনি হকচকিয়ে যাবেন। আরও ধরুন, আপনি রবীন্দ্র-সংগীতের পক্ষে আপনার অভিমতটা জানালেন এবং তখনই তিনি পাশের ঘরে গিয়ে রেকর্ড-চেম্বারে খানকতক বাছাই করা রবীন্দ্র-সংগীতের রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে আপনার কানে ইয়ার-ফোন সেঁটে দিয়ে, তাঁর দাঁত সারানোর কাজে ব্যাপৃত হলেন, তাহলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে?

এর ফলাফল, গান শুনলে যদি আপনার খুন করার প্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার অভ্যেস না হয়ে থাকে তবে আপনার দাঁতের মেরামতি কার্যে যেটুকু বেদনা আপনার প্রাপ্য, তার চেয়ে কমই আপনাকে কষ্ট পোহাতে হবে বলে মার্কিন ডাক্তারেরা মনে করেন। শারীরিক যন্ত্রণা লাঘব হওয়ার কারণ হিসাবে সংগীতের এই আহ্বান সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন যে, সংগীত বস্তুটি রোগীর যন্ত্রণাকাতর মনটাকে অন্যত্র নিবিষ্ট করে তোলে, যার ফলে মানসিক অস্থিরতা কমার সাথে সাথে যন্ত্রণাটাও মারাত্মক হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ ডেন্টিস্টের সিরিঞ্জে করে দাঁতের গোড়ায় 'অ্যানাসথেটিক' দেওয়ায় যে ফল পাওয়া যায়, গান অনেকটা সেই কাজই করে।

শুধু ডেন্টিস্টরাই নন, অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর বন্ধু এই সংগীত বস্তুটার সাহায্য নিয়ে ডাক্তাররা পরীক্ষা চালাচ্ছেন। তিন বছর পরীক্ষার পর শিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মেডিক্যাল রিসার্চ কেন্দ্র রোগীকে অন্য অ্যানাসথেসিয়া প্রয়োগ ছাড়াও সংগীতের সাহায্য নিচ্ছেন। অস্ত্রোপচারের আগের দিন রাত্রে রোগীকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি কি ধরনের সংগীত পছন্দ করেন। এবং অস্ত্রোপচারের আগে যে সব রোগীর অ্যানাসথেসিয়ায় ভালমত কাজ হয় না, তারাই প্রয়োজন মাফিক সংগীতের যাদুতে সহজেই কাবু হয়ে পড়ে। ডাক্তারদের মতে ছোটখাটো অস্ত্রোপচার করার জন্যে যেখানে ব্রোমাইড জাতীয় ওষুধ ব্যর্থ হয়, সেখানে সংগীতের নাকি অশেষ কার্যকারিতা।

শুধু অস্ত্রোপচার নয়, রোগীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ত্বরিত

উন্নতিবিধানে সংগীতের প্রয়োগ স্বার্থকতারই সন্ধান দিয়েছে। অবশ্য কোন ধরনের সংগীত কোন রোগীর ওপর কতটা কার্যকরী হবে এটা সুনিশ্চিতভাবে দেখার প্রয়োজনও অনুভূত হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে রোগী হাল্কা সুরের ভক্ত বলেই বীথোফেন, মোজার্টের উচ্চাঙ্গ-সংগীত যেমন কোন কোন রোগীর উন্নতির বদলে ক্ষতিই করে, তেমনি এ-দেশেও রোগীদের জন্যে এ ব্যবস্থার প্রয়োগ শুরু হলে হাল্কা সুর ও গুরু-সুরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোগের রাজ্যেও শুরু হবে।

মানসিক রোগীর হাসপাতালে সংগীতের প্রয়োগ ব্যাপকভাবে এ-দেশে বেড়ে গেছে। গান শুনতে শুনতে, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যে রোগী নির্বাক ছিল এতদিন, সেই হয়তো কেঁদে ওঠে, ডাক্তারকে শোনায় তার নির্বাক মনের বেদনা। মনঃচিকিৎসক অজস্র প্রশ্ন করেও যে রোগীর অসুস্থ মনের জট ছাড়াতে পারেন নি, তা রোগীই করে দেয় নিজে।

তবে এটা পরীক্ষিত হয়ে গেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগীর মানসিক অশান্তি প্রশমনের ব্যাপারে চটুল সুর কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারেনা। গভীর সুর, তা লোক-সংগীতই হোক বা শাস্ত্রীয় সংগীতই হোক রোগীদের বেশি খুশি করে তোলে। রোগীদের ঘুমোবার আগে অনেক মানসিক চিকিৎসালয়ে এইরকম সংগীতের ব্যবস্থা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। এতে করে রোগীর মানসিক অস্থিরতা অবিশ্বাস্যভাবে হ্রাস পেয়ে থাকে।

গান শোনাবার ছাড়া অনেকক্ষেত্রে রোগীদের যদি হাতে যন্ত্র বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ফলটা নাকি আরও ভাল হয়। সেতার বাজাতে না জানলেও তারগুলো নিয়ে টুং-টাং করার সময় কোন রোগীর এতক্ষণকার বিবর্ণ মলিন মুখের চেহারায় যদি সহজেই উজ্জ্বলতা দেখা যায়, মরা চোখ দুটো খুশিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে, তবে ডাক্তারদের মত সেটাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

অবিশ্যি সংগীতের এই ক্ষমতা আবিষ্কারের কৃতিত্ব মোটেই বিংশ শতাব্দীর স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নয়, কারণ পীথাগোরাস নামে এক ভদ্রলোক অনেক অনেককাল আগে হতাশা আর ক্রোধ সামলাতে এই ব্যবস্থাপত্র করে গেছেন, মধ্য শতাব্দীতে আবার হাসপাতালে কিছু প্রলাপ-বকা ও হতাশ রোগীর জন্যও গান শোনানো হত।

এ-বিষয়ে সত্যিই কোন সন্দেহ নেই, গান আমাদের সকলের স্বাস্থ্যের পক্ষেই ভাল জিনিস। কিন্তু ডাক্তারেরাই নাকি বলেন, কিছু কিছু সংগীতের ক্ষতি করার ক্ষমতা সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন নই : আর এই সংগীত নামেই সংগীত, ইনি বিরক্তিকর গোলমেলে শব্দ ছাড়া কিছু নন।

হাসপাতালের কয়েক গজ দূরে যেমন লেখা থাকে গোলমাল করিবেন না, তেমনি সুস্থ অসুস্থ আমাদের সব অবস্থার জন্যেই সংগীতের এই গোলমাল পরিহার করে শান্ত গভীর সংগীতে মনোনিবেশই আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণজনক—এটাই ডাক্তারী বিধান।

[হেল্থ হরাইজন

ভাবপ্রবণতা ও খাদ্য

রজত সেন

প্রত্যহ আপনি যা খান, স্বাস্থ্যের জন্য, তার অদলবদলের কথা আপনি কখনো কখনো ভাবেন কি? কিন্তু মনে রাখা দরকার খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ সবারই পক্ষে উপযুক্ত না-ও হতে পারে। এমন কি মেদ বহুলতা সত্ত্বেও, যে খাবার আপনি খাচ্ছেন, বিশেষজ্ঞের মতে সে-খাদ্যই আপনার উপযোগী।

ভাবতে পারেন এ আবার কেমনতর কথা! ডাক্তার এবং মনোবিজ্ঞানীরা এ-সমস্যা নিয়ে নিয়তই মাথা ঘামাচ্ছেন আমাদের মধ্যে অনেকেই কেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাই? প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন: শক্তি-সঞ্চয়ের জন্যই যে আমরা খাই তা নয়, জীবন-ধারনের যে উত্তেজনা, সে উত্তেজনাকে সহনীয় করবার জন্যই খাদ্যটা প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের দিনে খাওয়ার উদ্দেশ্য হয়েছে আনন্দ, সান্ত্বনা আর জীবনের যত কিছু অপ্রিয় পরিবেশ থেকে সাময়িক নিষ্কৃতি।

আবার কেউ কেউ আসন্ন ঝগড়া বা মনোমালিন্যের আশঙ্কায় পরিপাটি করে খেয়ে নেয়। লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন এমন লোকও বিরল নয় যার মুখ থেকে শুনতে পারেন দারুন ঝগড়া করতে হয়েছে, কমিটি সভ্যদের সংগে, প্রায় হাতাহাতির জোগাড়, চলুন মশাই, কিছু খাওয়া যাক। তার খাবার মেনু দেখলে আপনার মনে হবে বোধ হয় ভদ্রলোকের মোটা উপরি রোজগার হয়েছে নয়ত সারাদিন খাবার সময় পান নি।

অনেকে একটা কঠিন সমস্যায় পড়ে গিয়ে মোটা হতে আরম্ভ করে, যেমন ধরুন বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে এসেছে, বা নূতন কোন চাকরি, মোটা লেন-দেনের ব্যাপার, এমন কি অস্ত্রোপচার পর্যন্ত! অনেকেই বেশি খায় কারণ তাদের ভাল লাগছে না বা কোন কারণে দুঃখ বোধ করছে, অতএব একটা সান্ত্বনা ত চাই। আবার এমনও দেখা যায় যে-ক্ষেত্রে কেউ

কেউ মনে করেন বাড়িতে প্রচুর খাবার মজুত থাকা এক রকমের নিরাপত্তা। তার মাইনের তিন ভাগের দুভাগই হয়ত খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে খরচ হয়ে যায়; এর বক্তব্যটা শোনবার মত 'আমি যখন বাচ্চা ছিলাম, বাড়িতে কখনই পেট ভরে খাবার মত জিনিস থাকত না, আমি চাই আমার পরিবারে যেন এমনটি না ঘটে।'

একজন বিশেষজ্ঞের মতে বহুসংখ্যক লোক খেতে আরম্ভ করে দেয় যখন তাদের মধ্যে দেখা দেয় নৈরাশ্য, রাগ, ভয় বা আশঙ্কা; যেন খেতে থাকলেই এইসব অনুভূতি থেকে তারা রেহাই পাবে। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার ভাবপ্রবণতাই জীবনের মাপকাঠি; খাদ্যনিয়ন্ত্রণর ব্যাপারেও মনের ভারসাম্য প্রধান কথা।

কিছুদিন আগে নানা কারণে খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ইচ্ছুক ১১৬ জন লোকের একটা হিসাব নিকাশ করা হয়। এরা সবাই ডাক্তারের নির্দেশে খাদ্যনিয়ন্ত্রণে শুরু করে। এদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন ভারসাম্য স্থিরতায় যারা সাধারণের ওপরে; যারা সাধারণ, সহজেই ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে; আর সাধারণের নিচে,—যারা অহরহ নানাপ্রকার মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিন কাটায়।

প্রথম শ্রেণীর ৩২ জনের মধ্যে ১৬ জন 'চমৎকার।' বাকি ২৬ জন মাঝামাঝি তাদের ওজন কমল, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে। এঁদের অতিরিক্ত ওজনের কারণগুলি এমন কিছু একটা অসাধারণ নয়; সব সময় বসে কাজ করার অভ্যাস, এবং নিতান্তই গতানুগতিক জীবন। এদের মধ্যে যাঁরা মধ্যবয়স পেরিয়ে গেছেন তাঁরা অবশ্য বাধ্য হয়েই কাজ থেকে বিরত হয়েছেন। কিন্তু খাওয়াটা কমে নি। আবার কেউ কেউ শুধু লোভের বসেই খেয়ে গেছেন, কতটা খাবার যে এঁদের শরীর ধারণের জন্য প্রয়োজন, এ-কথা একবারও ভেবে দেখেন নি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ৪৪ জনের মধ্যে মাত্র ৬ জনের ফলাফল দেখা গেল 'চমৎকার।' ১২ জন মোটামুটি, ২২ জন সামান্য, আর ৪ জন 'সম্পূর্ণ অকেজো।' এই সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা—যাদের জীবনে বহু রকম ঝড়ঝাপটা সামলাতে হয়, তাদের সাধারণতই হয়ত একটু বেশি খাওয়ার প্রয়োজন হয় মন ভাল রাখবার জন্য। পরীক্ষক এক ডাক্তার বলেছেন, 'এদের সামন্যই শক্ত সমস্যা, এই যে দুশ্চিন্তা আর আশঙ্কা দূর করবার জন্য খাওয়া, এদের মাথায় ঢোকাতে হবে এটা ভুল, চিন্তাশঙ্কার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার অন্য উপায় এদের বাৎলে দিতে হবে।'

তৃতীয় শ্রেণীর ৪০ জন-যারা গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে—এদের মধ্যে মাত্র একজন সম্বন্ধে বলা যায় 'চমৎকার।' ১২ জন মোটামুটি, আর ২৭ জনের কিছুই করা যায় নি। এই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মত 'খাদ্যনিয়ন্ত্রণ করবার আগে এঁদের দরকার মনস্তাত্ত্বিক সাহায্য; মনের জটিল সমস্যার সুরাহা হবার আগে খাদ্যনিয়ন্ত্রণ এঁদের কোনই ফল হবে না। শুধু তাই নয়, ডায়েটিং এঁদের পক্ষে ক্ষতিকর, যদি না নৈরাশ্য আর ব্যর্থতার হাত থেকে প্রথমে এঁরা রেহাই পান।'

আজকের দিনে অনেক ডাক্তারই অতিরিক্ত-ওজন লোককেও খাদ্যনিয়ন্ত্রণ বা ডায়েটিং-এর পরামর্শ দিতে দ্বিধা

করেন। যদি তাঁরা দেখেন বিনা নিয়ন্ত্রণে এঁরা খোশমেজাজেই আছেন, সমাজে এবং ব্যবসাক্ষেত্রে কোনো গোলমাল দেখা দেয় নি, শুধুমাত্র মেদবৃদ্ধি ছাড়া শরীরে আর কোনই ব্যতিক্রম নেই।

মফঃস্বল শহরে পাদরীর স্ত্রী এলেন: হাস্যময়ী, মিষ্টিভাষিণী আর অক্লান্ত সেবাপরায়ণা: কাজে সেবায় স্নেহে সবাইকে আপন করে নিলেন: কিন্তু বয়সের তুলনায় ২০ পাউণ্ড ওজন বেশি: প্রায় বলতে গেলে হাসতে হাসতে মোটা হচ্ছেন। পাদরীর বৌ-এর এমন চেহারা হবে নাকি? কেমন সব কোমর-সরু, নিখুঁত-গড়ন মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাদরী-গিন্নী ডায়েটিং শুরু করে দিলেন। তিন মাসে ১৮ সাইজ থেকে ১৪ সাইজে এলেন। কিন্তু কোথায় পালাল সেই হাসিখুশি দিনগুলি, যখন মনের আনন্দে কাজ করে যেতেন, কখনই ক্লান্তি বোধ করতেন না? কেন তার মেজাজ খিটখিটে হয়ে আসছে? কেন তার কাজ করবার উৎসাহ নেই ব্যাপারটা কি?

ডাক্তার বললেন, 'অনেকে মোটা শরীরেই ভাল থাকে, আপনি তাদের মধ্যে একজন। অতএব—ডাক্তার হাসলেন।

আবার পাদরী-ঘরনী তেমনি স্থূলকায়া, তেমনি মধুর-স্বভাবা আর আনন্দের উৎস হয়ে উঠলেন।

মনমেজাজ যখন ভাল নেই তখন কিছুতেই ডায়েটিং করা উচিত নয়। টাকার চিন্তা কার নেই? ধরুন তার ওপর যদি মেদবৃদ্ধি হয়: ঘরসংসার ও থাকবেই, চাকরি বা ব্যবসা, তার ওপর যদি ডায়েটিং-এর চিন্তা করতে হয়, তাহলে নিশ্চয় মুশকিল বাধবে। একজন লেখক তাঁর উপন্যাস নিয়ে ব্যস্ত, শর্তের তারিখ এগিয়ে আসছে, পাণ্ডুলিপি দিতে হবে, না হলে দিতে হবে ইস্তফা, প্রাণপন চেষ্টা চলেছে। কিন্তু ইনি ডায়েটিং করছিলেন। এক সপ্তার মর্মান্তিক যাতনার পর খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ গেল চুলোয়; পাণ্ডুলিপি শেষ করতে হবে ত! না ডায়েটিং নিয়ে থাকব না। একটা লাইন আমি লিখতে পারি নি, টেবিলের ধারে সারাদিন শুধু বসেই থেকেছি আর ভেবেছি আলু সিদ্ধ-র কথা, ভেবেছি আপেল-পাই-এর কথা।'

যাঁরা মোটামুটি একক জীবন কাটান এবং বন্ধুবান্ধব যাঁদের নিতান্তই কম, স্থূলকায় সত্ত্বেও তাঁদের পক্ষে ডায়েটিং করা বিশেষ বিপজ্জনক। এঁদের মধ্যে মেয়েরা পড়েন—যাঁরা মধ্যবয়সী এবং বিশেষ কারণে কিছুটা অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে আছেন; আর সেই সব পুরুষ—যাঁরা পঞ্চাশ পেরিয়ে ষাটের দিকে এগুচ্ছেন। এঁরা আগে নূতন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পরে ডায়েটিং-এর কথা ভাবলে বিশেষ উপকৃত হবেন।

মধ্যবয়সী স্থূলকায় ব্যক্তিদের ডায়েটিং সুপারিশ করার আগে বিশেষ অবহিত হবার উপদেশ দেন বিশেষজ্ঞরা। এঁদের মধ্যে অনেক পুরুষ মেয়েই কাজের লোক, পরিশ্রমী, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কাজের দিক থেকে বা পারিবারিক তেমন কোন সুখশান্তি এঁরা নানা কারণে পান না। অতএব খাওয়াদাওয়ার আনন্দ, যখন খুশি, যত পরিমাণ খুশি খাওয়াই তাঁদের একমাত্র নিষ্কৃতি! ডায়েটিংকে সফল করতে হলে খাওয়ার একটা সন্তোষজনক বিকল্প কিছু দরকার— যেটা হবে খাওয়ার যে তৃপ্তি, তার পরিপূরক। অন্য কিছু, অন্য কোনো আকর্ষণের খোঁজ করা। ব্যাংকের হিসাব-

নিকাশ নিয়ে যারা ব্যস্ত তাদের গোলাপ-বাগান করবার নির্দেশ দিয়ে বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে। মধ্যবয়স্ক বড় চাকুরেদের পক্ষে গলফ্, নৌকা চালানো, শিকার বা ঘোড়ায় চড়া চমৎকার পরিপূরক।

বিপদের আশংকা এবং নানা রকম অসুবিধা সত্ত্বেও ওজন কমাতে পারেন এবং পারা উচিত। অতিরিক্ত ওজন বিশেষ বিশেষ কাজ করবার ক্ষমতা, এবং কি নীরোগ দেহ, এই সব কিছুর সংগী!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে: কেন আপনি অতিরিক্ত খান? এই বেশি খাওয়ার ব্যাপারটা কি? আপনি কি সব সময়েই খান? সারাদিন ধরে? শুতে যাবার আগে? এর জন্য কি আপনার নিজেকে অপরাধী মনে হয়?

দেখুন না উত্তরগুলি আপনার কাজে লাগে নাকি?

১। বিশেষ ব্যস্ত না হয়ে মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলুন। ঠিক করুন আপনি সপ্তায় এক পাউন্ড কি দু'পাউন্ড ওজন কমাবেন। একটা চার্ট দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে তাতে তারিখ আর ওজন লিখে রাখুন: এটা একটা পাহারা, আপনার মনের প্রহরীও বলতে পারেন।

২। ডায়েটিং-এর মাঝখানে এক আধবার নিয়মভংগ করুন, ইচ্ছে মাফিক খান—যদি তেমন কোনো কারণ ঘটে।

৩। অসাধারণত্বের দিকে মানুষের স্বাভাবিক ঝোঁক। সাধারণ একটা ডায়েট ঠিক করুন—দৈনন্দিন শক্তির জন্য যে-খাবার খাদ্য-প্রাণের অভাব নেই।

৪। ব্যায়াম করুন। যে-কোনো বয়সের লোকই প্রত্যহ কয়েক মিনিট অংগচালনা করতে পারেন, যা আপনার ভাল লাগে, যা আপনাকে প্রফুল্ল করে, যা আপনার সংসারের পরিপার্শ্বের সংগে খাপ খায়।

ডায়েটিং শুধুমাত্র কঠোর নিয়মতান্ত্রিক কোনো ব্যাপার নয়। এটা একটা মিতাচারের চারিত্রিক গুণ। ডায়েটিং দীর্ঘমেয়াদী একক কোনো পন্থা—যার দ্বারা আপনি জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবেন, গুরুভোজনে নয়।

[রীডার্স ডাইজেস্ট থেকে

টোকা জানিস, আমার দাদা এম-এ-তে অনার্স পেয়েছে।

বোকা এতে বাহাদুরীর কী আছে? ব্রিজ খেলতে বসে আমিও অনার্স পাই!

প্রেম মানুষের জীবনে ঈশ্বরের এক পরম আশীর্বাদ। যে ব্যক্তি তার চেতনায় এই স্বাদ থেকে বঞ্চিত নিঃসন্দেহে সে হতভাগ্য। শুধু পুরুষ নয় নারীর ক্ষেত্রেও এই কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ প্রেম যেমন পুরুষের ক্ষেত্রে একটি ধ্রুব প্রেরণার উদ্দীপনার তরংগ তুলে তাকে জীবনের ক্ষেত্রে বৃহৎ কর্মকাণ্ডে সমাহিত করে: তেমনি নারীর জীবনে প্রণয় একটি মধুর সংগীতের স্নিগ্ধতা দিয়ে তাকে শান্ত পরিণত ও উত্তর জীবনে মাতৃত্বের প্রতি নির্দিষ্ট করে।

অবশ্য প্রেমের স্পর্শধন্য অনেকেই আছেন যারা শেষ পর্যন্ত শিখাটিকে অম্লান ভাবে জ্বালিয়ে রাখতে পারেন নি —মধ্য পথে বা প্রণয়-বিমুগ্ধ-চিত্তে কিছু-দূর চলবার পর বহু নরনারীর জীবনে এই অনুভব বাসি টকো পাউরুটির মতো মনে হয়: বঞ্চিত তারাও কিন্তু হতভাগ্যের তালিকায় এদের নাম টাঙিয়ে দেওয়া যায় না। কারণ তাদের মনোমন্দিরে একটি বিস্তৃত স্মৃতি থেকে যায় অগোচরে—যা শ্বাশ্বত। পুরুষ বা নারীর জীবনে আমরণ যা ধ্রুব তারার মতো অমলিন হয়ে জ্বলতে পারে। বিষাদের আলো নিয়ে তিক্ত অন্ধকারকে দূর করতে পারে। একদা যে মন নিবেদিত হয়ে ব্যথা কুড়িয়েছে, তা অভিজ্ঞতার ভারকে এবং সেই তাৎক্ষণিক নিবেদনের বিশ্বাসে অশ্রুত ছন্দ হয়ে পরিব্যাপ্ত থাকে। হৃদয়-মন্দিরে তার আরতি চলে রক্তক্ষরণে। হয়তো তা এত গোপনে সংঘটিত হয়—যা ভুক্ত-ভোগীজনও নিজে জানতে পারেন না। মনের অবচেতন স্তর এ সব অনুভূতিকে

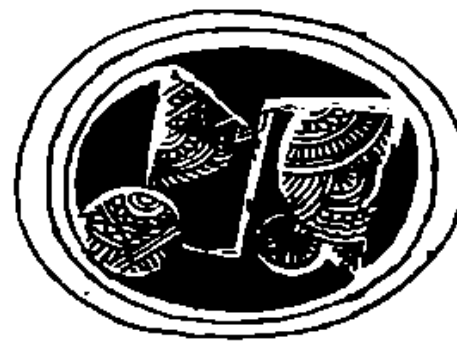

অজয় দাশগুপ্ত

সযত্নে কখন রেকর্ড করে রেখে দেয়। এর জন্য কোনো ভূমিকা বা প্রচেষ্টা নিষ্প্রয়োজন —এমন রেকর্ড হবেই।

এমনভাবে কতকাল কতদিন তা গভীরে থেকে যায় বা থেকে যাবে তা কেউ বলতে পারে না। চিরকালও হয়তো এর বহির্প্রকাশ না ঘটতে পারে—আবার কখনো কোনো বিশেষ অনবহিত মুহূর্তে, যেমন একটি রিমঝিম বরষায়, বা শীতার্ত রাত্রে বিনিদ্র কোনো স্টেশনে কিংবা রৌদ্র ঝলকিত নির্জন প্রান্তরে, জীবনে চলার পথে আকস্মিক সেই কাঙ্ক্ষিত মূর্তির সংগে দেখা হয়ে যাওয়ায় চেতনায় রেকর্ড চলতে শুরু করে, আর পুরনো সুর বেজে ওঠে। যা প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্তকে মথিত করে, অভিভূত করে কিছুক্ষণ। তারপর আবার অতীতের কুয়াশা বর্তমানের সামনে দাঁড়ায়। রেকর্ডটি অস্ফুট হতে হতে অবচেতনে হারিয়ে যায়।

প্রস্তাবনার বিষয় ছেড়ে এবার একটু আলোচনায় আসা যাক। একটি পুরুষ ও নারীর জীবনে যৌবনকালে সমভাবে সৃষ্টির প্রয়োজনে যে মিলন আকাঙ্ক্ষিত তাই মোটামুটি প্রেমরূপে জন্ম নেয়। অবশ্য এটা আমার একমাত্র বক্তব্য না যে কেবল প্রজননের তাগিদের প্রয়োজনই প্রেমের আয়োজন—যদি তা হত, তাহলে একটি সন্তানবতী নারী আর পরবর্তীকালে এই আকর্ষণে কোনো মোহেই পড়ত না। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীজগতের মধ্যে যেহেতু মানুষই একমাত্র মননশীল—সে-কারণ সে তার সমস্ত আয়ুষ্কালকে কতকগুলি প্রবৃত্তির ছকে বেঁধে নিয়ে সভ্যতার সড়কে অগ্রসর হয়েছে। প্রেম তেমনি একটি অনবদ্য প্রবৃত্তি। ক্রমসভ্যতার বিকাশ তাই প্রেমকে রাজসিংহাসন দিয়েছে। তার অর্থ আবার এই নয় যে মানুষ যখন অসভ্য ছিল তখন সে এই হৃদয়বৃত্তির দোলায় দোলে নি, তখন জৈবিক নিয়ম ছাড়া ভালবাসার আর অন্যতর ভূমিকা ছিল না। ছিল, ভালবাসা সেদিনও ছিল, আজও আছে। আবির্ভাবকাল থেকেই মানুষ স্বতন্ত্র এই বৃত্তি চেতনায় নিয়ে এসেছে। শুধু যুগে যুগে সভ্যতার বক-যন্ত্রে তার কামনা পরিশোধিত হয়ে বিশুদ্ধ আত্মমগ্নতায় রূপ নিয়েছে।

প্রেম আবার বহুবিধ; বহু খাতে এর প্রকাশ। এবং মোটাভাবে আমরা এই সবগুলোকে এক বলে ধরি—যেমন ধরা যাক পরিচয়ের মাধ্যমে মেয়ে পুরুষ এক ধরনের আলাপ করে সুখী হয়। নিজেদের ভেতর চিন্তার বিনিময়ে জীবনের বহু বিষয়ে ঐকাতা লাভ করে। যা একটি উচ্চস্তরের সখ্যতায় সীমাবদ্ধ থাকে। উভয়ের উভয়ের প্রতি এই আকর্ষণ কেবল মানসিক অন্তরঙ্গতার নির্দিষ্ট প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ। তেমনি শুধু কামনা থেকে একজন যুবক আর একজন যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হয় দৈহিক জৈব তাড়না থেকে। ঠিক এমনটি হয় অন্য একজন যুবতীর ক্ষেত্রে—সেও কোনো যুবকের আকর্ষণে তৃপ্ত হয় একই কারণে। তাদের মধ্যেও সাময়িক একটি নিবিড় এতাত্মতা জন্ম নেয়। যা ভবিষ্যতের মিলনকে আশু প্রয়াসী করে দু'জনকে কাছে টানে। অনেক ক্ষেত্রেই এই তাড়নার তীব্রতা একটি নির্মোকের আড়ালে প্রেমের ভানরূপে প্রকাশ পেয়ে ভ্রম জন্মায়। হয়তো সাময়িকতার ঊর্ধ্বে, দেহজ বাসনার শীতল অবলেপের পর—আবেগ প্রশমিত হয়ে গেলে এদের মধ্যে আর কোনো স্মৃতির দহন থাকবে না। যা অনশ্বর। এবং জীবনের বাকি দিন কেউ কাউকে আর মনে না রাখতেও পারে। ভিন্নমুখী স্রোতে নদীর মতো উভয়েই শুধুমাত্র প্রবাহিত।

এ ছাড়া বহু সময়ে একই পরিবেশে বড় হতে হতে কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত—একজোড়া ছেলেমেয়ে অবাধে মেশবার সুযোগ পায়। তারা হাত ধরে বয়সের ঘরে পা ফেলে পরিণত হয়েও কোনো কামনার দ্বারা পরিচালিত হয় না। বা ঠিক অন্তর্লীন চেতনায় নিবিড় অনুভূতিতে নিজেদের এক ভাবে না। যদিও হয়তো তারা তাদের প্রেরণা উদ্দীপনা শান্তি স্থিতির পরিপূরক হতে পারে। পরিবেশ, পরিজন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বোধ এদের ভাইবোনের সম্পর্কের একটি বৃত্তের মধ্যে ধরে রাখে। প্রেমের মতো মনে হলেও একে ঠিক প্রণয়-বিমুগ্ধতা বলা যায় না; এই নিমগ্নতার মধ্যে স্নেহর সুরটি অধিক ব্যাপ্ত।

প্রেমের ঠিক ব্যাখ্যা নিয়ে বহু মতান্তর আছে—এ একটি এমন শব্দ যার গভীরতা প্রশান্ত মহাসাগরের চেয়েও বেশি—যার ব্যাপ্তি হাওয়ার পরিমণ্ডলেরও অধিক। নব-পরিণীত কোনো স্বামী-স্ত্রী যখন দেহজ মিলনের মধ্যে দিয়ে নতুন দিগন্তে তাদের অস্তিত্বের অভিজ্ঞান তুলে ধরে—তখন এই একত্র সম্মিলিত যাত্রা দুজনের মধ্যে একটি অনায়াস সম্পর্কের আবহাওয়া গড়ে তোলে। যা অবশ্যই প্রেম—তবু এর মধ্যে 'সম্পর্ক-নির্ভর' কথাটাই মুখ্য।

প্রেম মাত্রই কামনা থেকে জন্ম নেয়—কিন্তু কামনায় পর্যবসিত হওয়াই তার লক্ষ্য নয়। যখন একটি নারী একটি পুরুষকে হৃদয়ের নৈবেদ্য দিয়ে পুজো করে—এবং তার বুকের ঘরে ঐ বিশেষ ব্যক্তির আসন স্থায়ী হয়ে যায়- তখন সেখানে কামনা ক্ষীণ হতে হতে অবশেষে এক সৌরভের মর্যাদা নিয়ে বিরাজ করে। যাতে দৈহিক মিলনের বাইরে তারা একাত্ম হয়ে একপ্রাণ-মন হয়। তেমনি একটি পুরুষের ক্ষেত্রেও। একটি সমগ্র অনুভূতি দুজনকে বিমূঢ় করে অনবদ্য ভূমিকায় আলো জ্বালে। পরবর্তী-কালে একে অন্যকে না পেলেও (বহু ক্ষেত্রেই পায় না) চিরদিন স্মৃতির মন্দিরে এই সৌরভকে বিছিয়ে রাখে। যার সুবাস চেতনায় জীবিত কাল পর্যন্ত একটি পরমার্থ এবং অনির্বচনীয় সুখ দিতে থাকে। যদিও নিষ্কাম প্রেম এ-জগতে দুর্লভ, কারণ প্রেমের জন্মলগ্নে কামনার কটাক্ষ অবশ্যম্ভাবী, তবু প্রকৃত প্রেমের পরশ আষাঢ়ের বৃষ্টির মতো কামনাকে ধুয়ে প্রেমাস্পদদের অমলিন করে। আর তাই তখন একে অন্যের সুখ অন্যের শান্তির নিমিত্ত মহান আত্মত্যাগের দ্বারা সামান্য সুখ লোভ লালসাকে জয় করে নিজেকে বঞ্চিত করতে পারে। অপরের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে নিজেও প্রায় সুখের ভাগী হয়। নতুন পরিবেশে গিয়েও পেছনের অম্লান ভালবাসার দিকে তাকিয়ে স্মৃতি নিয়ে শয্যালীন হতে পারে।

বছরের পর বছর অতিক্রম করে ক্রমশ যা মূলে আশ্রয়ী হয়ে দৃশ্যত মুছে যায়। কারণ প্রেমিক বা প্রেমিকা ব্যবহারিক জীবনে আপন বহিঃকর্মের বাস্তবতায়, মাতৃত্বর চাপে সৌরভটুকুকে গভীরে প্রোথিত করে অবচেতনে চালান করে। শুধু যা কখনো হঠাৎ পরশে মাঝে মাঝে রেকর্ড বাজিয়ে স্মৃতিকে মূর্ত করে সুখী হয়।

হীনত্বভাবনাযুক্ত মানুষের স্বভাব অনেকটা খরগোসের মতো

হীনত্বভাবনা

আনন্দ ভট্টাচার্য

হীনত্বভাবনার (ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স) মূল অর্থ হল নিজের মধ্যে অন্যের চেয়ে এক বা একাধিক কোন জিনিসের অভাব বোধ। তা হতে পারে সত্য অথবা নিছক মনগড়া। এবং নিজের প্রতি হীনত্বভাবনার চরম মনে হয় তখনই যখন আমরা কোন উপলক্ষে অন্যের সঙ্গে একত্রে মিলিত হই। যেমন কোন বিবাহ বাসর, বা সামাজিক কোন আনন্দানুষ্ঠানে কিংবা নিদেনপক্ষে বড় দোকানে মার্কেটিং করতে গিয়ে ভালমন্দ, গরিব বড়লোক, অসাধারণ গুণী, অগুণী সাধারণের যখন সমাবেশ ঘটে তখনই নিজেকে নিয়ে একটা বিব্রতভাব আসে। মনে হয় অমুকের সামনে আমি? কত ছোট, কত সাধারণ! কোন যোগ্যতার অধিকারে আমি রামবাবুর সামনে দাঁড়াতে পারি না।

আমিও মন্দ গাই না—কিন্তু অতগুলো লোকের সামনে কি গাওয়া যায়?

সলিলবাবুর চেহারা কি আর এমন... কিন্তু উনি বেশ পপুলার। আর আমায় কেউ যেন সহ্য করতে পারে না... বৈদ্যনাথ বড়লোক। ওর টাকার অভাব নেই, তবু তিনবার বি. এ. ফেল করল। আর আমি? পয়সার একটু স্বাচ্ছন্দ্য থাকলে আমি কবে বি. এ. পাশ করে যাই! সবই কপাল। এরকম এবং আরো বহু বিচিত্র রকমের হীন চিন্তা আমাদের মধ্যে প্রায়ই কোন না কোন এক দুর্বল মুহূর্তে দেখা দেয়। নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্যের জোরে হীনত্ব ভাবনা অনেকেই কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক হয়ে যান, আর কেউ তা পারে না।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে দৈহিক, মানসিক আর্থিক, শিক্ষাগত ও সামাজিক অবস্থা ইত্যাদিতে কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তার বাইরে যেন কিছুতেই কিছু করা যায় না। এই সীমাবদ্ধতাকে বলি 'অভাববোধ।' এই অভাববোধই আমাদের মনে হীনত্ব বোধের জন্ম দেয়। আমি ছাড়া আর সকলে বেশ আছে। পৃথিবীতে ওদের প্রয়োজন আছে আমার নেই..

কোন মেয়ের যদি চুল খারাপ হয় কিংবা যদি সে হঠাৎ মোটা হয়ে যায় তো তার মধ্যে অন্যান্য গুণ থাকা সত্ত্বেও ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের উৎপত্তি হতে দেখা যায়। তেমনি, কোন ছাত্রের মধ্যে দৈহিক কিছু খর্বতা হয়ত আছে, অমনি সেও এই অভাব বোধের জন্য অন্যের সঙ্গে সহজ হয়ে মিশতে পারে

না। এবং ক্রমশ অসামাজিক হয়ে পড়ে।

ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স এর অন্বেষক শ্রীআলফ্রেড অ্যাডলার বলেন যে—এই হীনত্বভাবনার বীজ ছেলেবেলাতেই বপন করা হয়। এবং এজন্য দায়ী প্রধানত বাপ-মার ভুল শিক্ষাপদ্ধতি। বিশেষ করে যে পরিবারে বা জায়গায় শিশুর সংখ্যা বেশি সেখানেই এর দৌরাত্ম্য বেশি। শিশু বয়সের প্রধান কাম্য হল আদর যত্ন, স্নেহ-ভালবাসা। এসবের একটু উনিশ-বিশ হলে ওদের মধ্যে এমন একটা মনোভাব দেখা যায় আমার মা আমায় ভালবাসে না। ওর মা ওকে খুব ভালবাসে তাই ও ভাল। ঠিক আছে আমিও দেখিয়ে দেব যে আমি ওর চেয়ে খারাপ নই। এর ফল উত্তরকালে ভালও হতে পারে আবার মন্দও। বলাবাহুল্য, মন্দ অর্থাৎ হীনত্বভাবনারনজিরটাই চোখে পড়ে বেশি। এছাড়াও এর আরো একটা প্রধান কারণ হল জন্মগত দৈহিক অপূর্ণতা, খর্বতা, পঙ্গুত্ব অথবা অন্য কোন খুঁত যেটা সহজেই ব্যক্তির মানসিক সুস্থ বিকাশের পক্ষে পরিপন্থী। কিন্তু এরও ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। ডেমস থেনিস তোতলা ছিলেন কিন্তু উত্তরকালে হয়েছিলেন একজন নামকরা বক্তা। পায়ে পক্ষাঘাত হওয়া সত্ত্বেও রুজভেল্ট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। তেমনি এচ. জি ওয়েলস খোঁড়া হয়েও জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিক। এনেট কেলারম্যানও পঙ্গু ছিলেন কিন্তু সাঁতারু হিসেবে তিনি চ্যাম্পিয়ানও ছিলেন। প্রেমে হতাশ ব্যক্তি অনাপথে পথ খুঁজে পেয়ে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন এমন নজিরও আছে। একটি লাজুক ও অসামাজিক ছেলে লেখাপড়ায় ভাল রেজাল্ট করে ফার্স্ট প্রাইজগুলো অনায়াসেই প্রতি বছর নিয়ে যায়।

এসবগুলিই হল ব্যতিক্রম। হীনত্বভাবনাকে জয় করার এগুলি হল দৃষ্টান্ত।

শিশুদের পক্ষে আদর যত্ন ও স্নেহ ভালবাসা ততখানিই প্রয়োজনীয় যতখানি দরকার একটি মানুষের বাঁচার জন্য আলো-বাতাসের। ও যেন সবসময় এটা জানে যে তার বাপ-মার স্নেহ থেকে ওকে কেউই বঞ্চিত করতে পারে না। মা-বাপ ওর কাজে অসন্তুষ্ট হতে পারে — কিন্তু ওর প্রতি নয়। সাধারণত যেসব শিশুরা গোড়া থেকেই মা-বাপের পূর্ণ এবং সমান স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে মানুষ হতে থাকে, তারা তাদের জীবনে কখনই হীনত্বভাবনার কবলে পড়ে না। অপূর্ণতার ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে—কিন্তু ওটা কখনও না।

হীনত্বভাবনাযুক্ত মানুষটির স্বভাব হয় অনেকটা খরগোসের মত। খরগোস নিজের ছোট্ট ঘরটুকু ছাড়া আর কিছু জানে না—মাঝে মাঝে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে, আবার অস্থির হয়ে ঢুকে পড়ে। সর্বদা ভয়—যদি কোন বিপদ-আপদ এসে পড়ে! তার চেয়ে ঘরের কোণে থাকা ভাল। তেমনি, বাইরে যখন ব্যক্তিটি সহসা বেরিয়ে পড়ে, অর্থাৎ পাঁচজনের সামনে যখনই ব্যক্তিটি হাজির হয় তখনই হয় বিপদ। নিজেকে হারিয়ে ফেলে। চিনতে পারে না। খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে হয়কি, একটা মুখোসের অন্তরালে নিজেকে ঢেকে রেখে অতি সন্তর্পণে মেলামেশা করে। প্রাণে ভয় একটু অসতর্ক হলে তার আসল রূপ বেরিয়ে পড়বে। এর পরিণত ফল হল জীবনে সে তার ঠিক ঠিক উপযোগিতা বুঝতে পারে না—ঠিক যে কাজ করা উচিত সে কাজ পায় না এবং তার এইসব অবদমিত ও অপূর্ণ

MAHA-2008

বাসনাগুলি ভিন্ন উপায়ে ও ভিন্ন পথে পরিচালিত হয়ে সন্তুষ্টি খুঁজে পায়। যেমন (১) নিজের বিষয় উচ্চ ধারণা আমিই সবচেয়ে ভাল, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত ইত্যাদি।

(২) তিক্ততা। অপরকে হেয় দেখা।

(৩) প্রতিহিংসার তীব্র ইচ্ছা এবং সেই মত কাজ করা। যেমন কাউকে অপদস্থ বা বিব্রত করা, ক্ষতি করা ইত্যাদি।

(৪) নিষ্ঠুরতা অকারণ নিষ্ঠুর হওয়া এবং অপরাধ করার প্রবণতা ইত্যাদি।

এসব কাজে 'মজা' দেখার যে আনন্দ ব্যক্তিটি তাতেই সন্তুষ্টও আনন্দিত।

এছাড়া, যেগুলির উপর মানুষের কোন হাত নেই তেমন কারণ ঘটিত যে হীনত্ব-ভাবনা, তার প্রতি করুণা হওয়া স্বাভাবিক। (১) সৌন্দর্যের অভাব। (২) রুগ্ন বা ভগ্ন স্বাস্থ্য। (৩) পৌরুষের অভাব। (৪) ব্যক্তিত্বের অভাব। (৫) অযোগ্যতা (৬) বুদ্ধির অনুৎকর্ষতা। (৭) যৌন বিমুখতা প্রভৃতি। এই সব অভাববোধ থেকে মুক্তি পেতে গেলে এগুলিকে যে পেতেই হবে, তেমন কোন কথা নেই। কেননা, এর মধ্যে প্রায়গুলিই অপ্রাপ্য দু-একটি ছাড়া। তাহলে উপায় কি?

উপায় হল এইসব অভাবের প্রতি একটা যুক্তিপূর্ণ ও সহযোগী দৃষ্টিভঙ্গী রাখা। উদার দৃষ্টিভঙ্গী হলে তো খুবই ভাল—না হলেও, অনুদার হওয়া উচিত হবে না।

মোটামুটিভাবে হীনত্বভাবনাকে জয় করতে হলে জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে চলবেন না। স্বাভাবিকভাবে কাজটিকে দেখতে হবে। আমার শক্তি কতটুকু—ততটুকু এবং সেই ভাবেই আমার কাজ করতে হবে।

অহেতুক ভয় ত্যাগ করতে হবে। একটা এমনই জিনিস যেটা আমাদের ভ সময় ভুল বা অপরাধ করার হাত বাঁচিয়ে দেয়। কিন্তু এটি এমনই মারা যে মানুষকে অত্যন্ত দুর্বল করে দে

সবচেয়ে ভাল উপায় হল, নিজে বিলিয়ে দিন। নিজের মধ্যে ঝুটা আ ভাব ত্যাগ করে পাঁচজনের সংগে মে পড়ুন। দেখুন দুনিয়াটাকে—কোন দি চলছে, কি চায় লোকে আজ। পাঁচজ সংগে পরিচিত হোন—কথা বলুন। তা সুখ দুঃখের অংশীদার হোন—নিজেরা অপরকে বলুন সময় সুযোগ ক জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পরীক্ষা যান। বিপদ এলে পিছপা হবেন না বে বেন জীবনের ফ্যাকাসে রঙ পালটে সে

দুনিয়াটা প্রকান্ড বড় এবং সবা কাছে এর মূল্য অপরিসীম এবং আ আপনার কাছেও মূল্য সমান। জীব প্রতি ভয়—নিজের প্রতি হীনত্বভ অবসানের আরো একটা বড় পথ হল ভা প্রচুর পড়াশুনা করুন। যতটুকু হাতে পান পড়ার সদ্ব্যবহারে লাগান

মোট কথা জীবনটাকে চিনুন—জান নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখুন কোথ কেন গলদ আপনার এবং সে অ্যাডজাস্ট করে চলুন। মনে রাখ পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে কেউ কাছে ছোটও নয় বড়ও নয়। সব নিজের আত্মা ও জীবনকে বিশ্লেষ দুনিয়াকে বা আর সবাইকে ভাবতে দেখবেন, এতেই কমপ্লেক্সের হাত মুক্তি পেয়ে এক সুন্দর জীবনের আপনিও দাঁড়াতে সক্ষম।